সাম্যবাদ

বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল (মার্কসবাদী)-এর মুখপত্র
চতুর্থ বর্ষ, ৫ম সংখ্যা ● মে ২০১৮ ● পাঁচ টাকা

মাছের অভাব পূরণ করে যারা তাদের দুঃখ ঘোচাবে কে?

শ্রমজীবীদের গল্প

মাত্র নয় বছর বয়সে বাবার হাত ধরে মাছ ধরতে নদীতে যাওয়া শুরু করেছিল চাঁদপুরের বড় স্টেশন ৭নং ওয়ার্ড টিলাবাড়ি নদীর পাড়ের নাজমুল হোসেন। গত ১৫ বছর ধরে মেঘনার বুকে মাছ ধরেই তার জীবন চলেছে। কেমন আছে জানতে চাইলে বলল, 'বাইচা থাকার লাইগা আমরা প্রতিদিন সংগ্রাম কইরা যাই। একটু বাইচা থাকার লাইগা। রোদে শুকাই, বৃষ্টিতে ভিজি কিন্তু আমাগো কপাল ভিজে না। মাঝে মাঝে মনে হয় *(৭ম পৃষ্ঠায় দেখুন)*

নতুন 'মে দিন' আনতে হবে শ্রমিকদের

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধেও ইউরোপ অমেরিকার সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত শ্রমিকদের খাটানো হতো। এমনকি কোনো কোনো ক্ষেত্রে, বিশেষ করে আমেরিকায় ২০ ঘণ্টা পর্যন্ত কাজ করতে বাধ্য করা হত। অনেকটা বাংলাদেশের গার্মেন্টস শিল্পের শ্রমিকদের মতো। পুঁজিবাদী বিশ্বের সর্বত্রই প্রায় একই রকম অবস্থা ছিল। ঊনবিংশ শতাব্দীতে কাজের ঘণ্টা কমানোর দাবিতে বড় বড় আন্দোলন হয়। শ্রমিক শ্রেণির অকৃত্রিম বন্ধু, পথপ্রদর্শক মহান কার্ল মার্কস ও ফ্রেডারিখ এঙ্গেলস শ্রমিক শ্রেণির রাজনৈতিক মতাদর্শ তুলে ধরেছিলেন। তাঁরা ডাক দিয়েছেন, 'দুনিয়ার মজদুর এক হও'। মার্কস-এঙ্গেলস শ্রমিক শ্রেণিকে দেখিয়েছেন তাদের ঐতিহাসিক কর্তব্যের পথ। এরই পথ বেয়ে বিশ্বব্যাপী শ্রমিক আন্দোলন জোরদার হয়। ১৮৮৬ সালের এপ্রিল মাসে *(৬ষ্ঠ পৃষ্ঠায় দেখুন)*

অর্থনৈতিক সংকটের গতিমুখ কোন দিকে?

ব্যাংক খাতে সম্প্রতি সংঘটিত একের পর এক দুর্নীতির জের ধরে দেশের পুঁজিবাদী অর্থনীতি হুমকির মুখে পড়েছে। বিশ্লেষকদের আশঙ্কা, নিয়ন্ত্রণহীন এই লুটপাট যদি থামানো না যায়, তাহলে দেশের আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতি দুই-তিন বছরের মধ্যেই ভয়াবহ রূপ নিতে পারে। আসলে যে-কোনো অর্থনৈতিক সংকটে সবচেয়ে বেশি মাশুল দিতে হবে শ্রমজীবী মানুষ এবং মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্তকে। যাদের কারণে এই সংকট, তারা ততটা ভুগবে না। কারণ, জনগণের টাকায় ওইসব লুটেরাদের 'বেইল আউট' করা হয়।

এই লুটপাটের নেতৃত্ব দিচ্ছে তথাকথিত ব্যবসায়ীদের একটা অংশ। এদের 'তথাকথিত' বলার কারণ হচ্ছে – বলতে গেলে এদের তেমন কোনো পণ্য উৎপাদন নেই। শুধু ব্যাংক ঋণ পাওয়ার জন্যই এরা কিছু পণ্যের উৎপাদন দেখায়। আগে এই লুটপাটকারীরা ব্যাংক ঋণ আত্মসাৎ করতো, আর এখন দখলে নিচ্ছে পুরো ব্যাংকই। লুটপাটের নতুন এই ধরন শুরু হয়েছে ২০১৭ সাল থেকে।

পুঁজিবাদী অর্থনীতিতে লুটপাট একটি সাধারণ বিষয়। ইউরোপের পুঁজিতন্ত্র বিকশিত হয়েছে সারা দুনিয়া জুড়ে ছড়িয়ে থাকা উপনিবেশগুলি লুট করে। আবার ভারতসহ বিভিন্ন দেশে রাষ্ট্রীয় সম্পত্তি দখলের মাধ্যমেই পুঁজিতন্ত্রের বিকাশ হয়েছে। বাংলাদেশেও এর ব্যতিক্রম হয়নি। কিন্তু বর্তমানে বাংলাদেশের পুঁজিবাদী অর্থনীতির প্রধান সংকট হচ্ছে দেশ থেকে পুঁজি পাচার।

প্রশ্ন হলো, কীভাবে এই পুঁজি পাচার হচ্ছে? ব্যবসা-বাণিজ্য তো বৈধভাবেই হচ্ছে, তাহলে মুদ্রাপাচার কীভাবে হচ্ছে?

কারখানায় শ্রমিক, জমিতে কৃষক আর বিভিন্ন সেবাখাতে মধ্যবিত্ত যে শ্রম দেয়, তার মাধ্যমেই পুঁজি তৈরি হয়। এই পুঁজির স্থানিক রূপ হচ্ছে টাকা আর বৈশ্বিক প্রতীক হচ্ছে মার্কিন ডলার। বাংলাদেশ থেকে এখন প্রধানত দুই প্রক্রিয়ায় পুঁজি বা টাকা পাচার হচ্ছে। এই ধরনগুলো হচ্ছে – আমদানির সময় পণ্যের নির্ধারিত দামের সময় বেশি মূল্য দেখানো আর রফতানির সময় কম মূল্য নির্ধারণ করা। সরকারি প্রতিষ্ঠান 'বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ব্যাংক ম্যানেজমেন্ট' দীর্ঘদিন ধরে এই প্রক্রিয়ায় পুঁজি পাচার বা মুদ্রাপাচারের বিষয়ে সতর্ক করে আসছে।

টাকা পাচার করার জন্য দেশের পুঁজিপতিদের একটা অংশ এই উভয় প্রক্রিয়াই অনুসরণ করছে। আর এ কাজে ব্যবহার করছে তাদের দখল করা ব্যাংকগুলোকে। বাংলাদেশ ব্যাংকও তাদের এই *(২য় পৃষ্ঠায় দেখুন)*

লক্ষাধিক স্বাক্ষরসহ স্মারকলিপি পেশ

পিইসি বাতিল ও প্রশ্নফাঁস বন্ধ করুন

প্রায় তিন মাস ধরে সারাদেশে সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্টের উদ্যোগে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী (পিইসি) বাতিল ও প্রশ্নপত্র ফাঁস বন্ধের দাবিতে দেশব্যাপী লক্ষাধিক স্বাক্ষর সংগৃহীত হয়েছে। সেই স্বাক্ষর ১৩ মে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে পেশ করা হলো। সারাদেশে একই দাবিতে জেলা প্রশাসকের মাধ্যমে দুই মন্ত্রণালয়ে স্মারকলিপি দেয়া হয়েছে। স্বাক্ষর সংগ্রহকালে শিক্ষার্থী-অভিভাবক-পেশাজীবী ও সমাজের সচেতন ব্যক্তিবর্গের উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা, ক্ষুব্ধতা ছিল চোখে পড়ার মতো। পিইসি পরীক্ষা কেন বাতিল করা প্রয়োজন এ বিষয়ে বলতে গিয়ে একজন অভিভাবক বলেছেন " আমার বাচ্চার খেলার সময় নেই, আত্মীয় স্বজনের বাড়িতে যাওয়ার সুযোগ নেই। সকাল ৬ টা থেকে রাত ১১টা পর্যন্ত স্কুল, কোচিং সেন্টার আর বইয়ের বোঝায় তাদের দিন কাটে।" জীবনের সবচেয়ে প্রাণবন্ত সময়ের আনন্দ উচ্ছ্বাস কেড়ে নিচ্ছে পরীক্ষার *(২য় পৃষ্ঠায় দেখুন)*

দ্বিশততম জন্মবার্ষিকীতে

সংকল্পে, সংগ্রামে, মানবিকতায় কার্ল মার্কসকে স্মরণ

গত ৫ মে ছিল মহান দার্শনিক, সর্বহারার মহান নেতা কার্ল মার্কসের ২০০তম জন্মবার্ষিকী। ১৮১৮ সালের ৫ মে, প্রুশিয়ার (একীভূত রাষ্ট্র হিসেবে তখন পর্যন্ত জার্মানি গঠিত হয়নি, প্রুশিয়া তখন একটি আলাদা রাজ্য) রাইন প্রদেশের ট্রিয়ের শহরে এই মহান দার্শনিকের জন্ম হয়। হেগেল দ্বারা প্রভাবিত একজন বিপ্লবী গণতন্ত্রী (Radical democrate) হিসেবে মার্কসের রাজনৈতিক জীবনের শুরু হয়। আর তাঁর জীবন যখন সমাপ্ত হয়, তখন তিনি মানবমুক্তির দর্শন মার্কসবাদের উদগাতা যে আদর্শ নিয়ে বিশ্বের প্রান্তে প্রান্তে এখনও মানুষ লড়াই করে যাচ্ছে।

এ উপলক্ষে গত ৫ মে বাসদ (মার্কসবাদী)'র উদ্যোগে ঢাকার তোপখানাস্থ বাংলাদেশ শিশু কল্যাণ পরিষদ মিলনায়তনে একটি আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। আলোচনা সভায় আলোচক হিসেবে ছিলেন বাসদ (মার্কসবাদী)'র কেন্দ্রীয় কার্যপরিচালনা কমিটির সাধারণ সম্পাদক কমরেড মুবিনুল হায়দার চৌধুরী এবং বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবী, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইমেরিটাস অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী।

অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী বলেন, "মার্কসের মৃত্যুর দু'দিন পরে, তৃতীয় দিনে মার্কসের সমাধিক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে তাঁর অকৃত্রিম বন্ধু এঙ্গেলস বলেছিলেন, 'আমাদের সময়ে সবচাইতে বড় চিন্তাবিদ যিনি ছিলেন দু'দিন আগে তিনি চলে গেছেন।' এটা অত্যন্ত সত্য কথা। মার্কসের কালে কোনো মানুষ ছিলেন না যার সাথে তাঁর তুলনা চলে। আমরা ডারউইনের কথা জানি, তিনি বৈপ্লবিক পরিবর্তন এনেছেন জীববিজ্ঞানের ক্ষেত্রে, মার্কস এনেছেন সমাজবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে। কিন্তু মার্কসের ক্ষেত্রটা অনেক বেশি প্রসারিত ছিল। ডারউইন তাঁর বিশেষ ক্ষেত্রে চিন্তা করেছেন, মার্কস কিন্তু ডারউইনের তত্ত্ব ও অন্য সমস্ত বৈজ্ঞানিক তত্ত্বকে সংযোজিত করেছেন। সে জ্ঞান জার্মান দর্শনের, সে জ্ঞান ফরাসি বিপ্লবের চর্চার, সে জ্ঞান ইংল্যান্ডের অর্থনীতির চর্চার। *(৩য় পৃষ্ঠায় দেখুন)*

নারী-শিশু নির্যাতনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে সোচ্চার হোন পৃষ্ঠা-৪

দেশব্যাপী কার্ল মার্কসের দ্বিশততম জন্মবার্ষিকী পালন পৃষ্ঠা-৫

গণপরিবহনে চরম অব্যবস্থাপনার দায় কার? পৃষ্ঠা-৫

শিল্পাচার্য জয়নুল : সমাজের প্রতি দায়বদ্ধ এক শিল্পসাধক পৃষ্ঠা-৫

অর্থনৈতিক সংকটের গতিমুখ কোন দিকে?

(১ম পৃষ্ঠার পর) অনিয়ন্ত্রিত পুঁজি পাচার বন্ধ করতে পারছে না। কারণ, ব্যাংকিং সেক্টরের নিয়ন্ত্রক সংস্থাটির উচ্চপদে বসানো হয়েছে ওইসব লুটেরা-পাচারকারীদের প্রতিনিধি। এর সাথে যুক্ত হয়েছে রাষ্ট্রীয় সর্বোচ্চ ক্ষমতার ব্যবহার।

এরপরও টাকা পাচারের ছোট কিছু ঘটনা সম্প্রতি গণমাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছে। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের প্রতিবেদনে বলা হচ্ছে, এবি ব্যাংকের মাধ্যমে গত দুই বছরে সিঙ্গাপুর ও আরব আমিরাতে পাচার হয়েছে ৫০৫ কোটি টাকা। অন্য ব্যাংকেও এই ধরনের পাচার এখন দেদারছে চলছে। কিন্তু সেখানে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের পরিদর্শন দল স্বাধীনভাবে কাজ করার অনুমতি পায়নি। এবি ব্যাংকের মালিকগোষ্ঠীর একটা বড় অংশ ক্ষমতার বাইরে থাকা বিএনপি'র বলে এই ধরনের কেলেঙ্কারির তথ্য প্রকাশিত হয়।

সিঙ্গাপুরের সংবাদপত্র দ্যা বিজনেস টাইমস ২০১৬ সালের জুলাইয়ে এক প্রতিবেদনে জানিয়েছে, বাংলাদেশের এস আলম গ্রুপ সেখান ৮১০ কোটি টাকা দিয়ে বড় স্থাপনা কিনেছে। ওই সময় সাংবাদিকরা কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কর্মকর্তাদের কাছে এ বিষয়ে জানতে চাইলে তারা মন্তব্য করতে অপারগতা প্রকাশ করে। প্রসঙ্গত, বাংলাদেশ থেকে কোনো ব্যবসায়ী দেশের বাইরে বিনিয়োগ করতে চাইলে কেন্দ্রীয় ব্যাংক ও সরকারের অনুমোদন নিতে হয়। কিন্তু এস আলম গ্রুপের এই ধরনের কোনো অনুমোদন ছিল না।

টাকা পাচারের পাশাপাশি এই গ্রুপটি গত এক বছরে ইসলামী ব্যাংক, সোশ্যাল ইসলামী ব্যাংক ও বাংলাদেশ কমার্স ব্যাংক দখল করে নিয়েছে। এছাড়া ইউনিয়ন ব্যাংক, আল-আরাফাহ ব্যাংক, এনআরবি গ্লোবাল ব্যাংক ও ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক এখন এই গ্রুপের মালিকানাধীন।

এস আলম গ্রুপের পাশাপাশি বেক্সিমকো, এজি অ্যাগ্রো লিমিটেড, ইলিয়াছ ব্রাদার্সসহ আরও বেশকিছু প্রতিষ্ঠান বিপুল অংকের ব্যাংক ঋণ নেওয়ার মাধ্যমে অর্থনীতিকে ঝুঁকির মধ্যে ফেলে দিয়েছে। আর এই ধরনের লুটপাটের খেসারত দিতে গিয়ে ফার্মার্স ব্যাংক দেউলিয়া হওয়ার পথে বসেছে। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে একই রকম লুটপাট হয়েছে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকগুলোতে। এসব ব্যাংককে বাঁচানোর জন্য সরকার ২০০৯ সাল থেকে এখন পর্যন্ত ১৮ হাজার ৫০৫ কোটি টাকার বেইল আউট দিয়েছে। আগামী অর্থবছরেও দেওয়া হবে ২ হাজার কোটি টাকা। অন্যথায়, এসব সরকারি ব্যাংক অনেক আগেই দেউলিয়া হয়ে যেত।

বর্তমানে ব্যাংকিং সেক্টরে ভয়াবহ রকমের টাকার সংকট চলছে (তারল্য সংকট)। এই টাকা গেল কোথায়? দেশীয় ও আন্তর্জাতিক বিভিন্ন সংস্থা বলছে, মুদ্রাপাচারের জের ধরেই এই সংকটের উদ্ভব। গ্লোবাল ফাইনান্সিয়াল ইন্টিগ্রিটির প্রতিবেদন অনুযায়ী, বাংলাদেশ থেকে ২০০৫ থেকে ২০১৪ সাল পর্যন্ত ৬১.৬৩ বিলিয়ন ডলারের মুদ্রাপাচার হয়েছে। ২০১৪ পরবর্তী বছরগুলোতে পাচার হওয়া টাকার পরিমাণ কত সে বিষয়ে সংস্থাটি এখনও কোনো প্রতিবেদন প্রকাশ করেনি। তবে এই হার যে বেড়েছে তা ব্যাংকগুলোর খেলাপি ঋণের ব্যাপকতাই ইঙ্গিত দেয়। ২০১৭ সালে খেলাপি ঋণ বেড়ে ৭৪ হাজার ৩০৩ কোটি টাকা দাঁড়িয়েছে, যা আগের বছর ছিল ৬২ হাজার ১৭২ কোটি টাকা।

প্রশ্ন হচ্ছে, এভাবে কতদিন চলবে? এর পরিণতি কী হবে?

মুদ্রা পাচার আর খেলাপি ঋণের এই সংকটের যদি এখনই লাগাম টানা না যায়, তাহলে গোটা আর্থিক খাত ভয়াবহ এক সংকটের মুখে পড়ে যাবে।

প্রথমত, ব্যাংকগুলো ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান ও আমানতকারীদের টাকা সরবরাহ করতে ব্যর্থ হবে। একই সঙ্গে আমদানি ব্যয় মেটানোর জন্য প্রয়োজনীয় ডলার সরবরাহও করতে পারবে না। প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহ করতে না পেরে শিল্প কারখানাগুলো বাধ্য হবে তাদের উৎপাদন কমাতে বা বন্ধ করতে। সেবা খাতও এই সঙ্কট থেকে মুক্তি পাবে না। পরিণামে লাখ লাখ শ্রমিক ও পেশাজীবী বেকার হবে। ২০০৮ সালে উত্তর আমেরিকা ও পশ্চিম ইউরোপ এই রকম সঙ্কটে পড়েছিল।

প্রশ্ন উঠতে পারে, বাংলাদেশ ব্যাংক ও সরকার কি টাকা ছাপিয়ে এই সংকট থেকে মুক্তি পেতে পারে? সাধারণভাবে মনে হয়, পারে। কিন্তু অর্থনীতির নিয়ম অনুযায়ী তা সম্ভব নয়। কারণ, সুনির্দিষ্ট সম্পদের বিপরীতে টাকা ছাপাতে হয়। অন্যথায়, মূল্যস্ফীতি বেড়ে যাবে। একই রকম সংকটের মুখোমুখি হয়েছিল জিম্বাবুয়ে। দেশটি মিলিয়ন ডলারের নোট ছাপিয়েও সঙ্কটের মোকাবেলা করতে পারেনি।

আপাতত শ্রমজীবী মানুষের পাঠানো বৈদেশিক মুদ্রার (রেমিট্যান্স) মাধ্যমে অর্জিত ডলারের মাধ্যমে অর্থনীতির এই সংকট মোকাবেলা করা হচ্ছে। কিন্তু দীর্ঘমেয়াদে এটা সামাল দেওয়া সম্ভব নয়। কারণ, মুদ্রাপাচার যে গতিতে হচ্ছে, সে হারে রেমিট্যান্স আসছে না। বাংলাদেশের চলতি হিসাবের গতিপ্রকৃতি দেখলে এ সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা পাওয়া যায়। চলমান অর্থবছরের প্রথম আট মাসে চলতি হিসাবে ঘাটতি দাঁড়িয়েছে ৭.০৬-৭.০৭ বিলিয়ন ডলার। এটা ইতিহাসের সর্বোচ্চ ঘাটতি। 'চলতি হিসাব' হচ্ছে একটি দেশ থেকে বৈধপথে ব্যবসা-বাণিজ্যের মাধ্যমে কী পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা আসল এবং গেল তার ফলাফলের সূচক। এই ধরনের রেকর্ড ঘাটতি আগে কখনোই বাংলাদেশ মোকাবেলা করেনি।

অর্থনীতির এই পুরো পরিস্থিতিকে কেউ বলছেন টাইম বোমা, কেউ বলছেন ভূমিকম্পের পূর্বাভাস। নাম যাই দেওয়া হোক, সংকট চূড়ান্ত রূপ নিলে তার ফলাফল কী হতে পারে সেটা প্রতিটি সচেতন মানুষকে অবশ্যই ভেবে দেখতে হবে।

কুছ্ পরোয়া নেহি!

(শেষ পৃষ্ঠার পর) বিদ্যুৎ-গ্যাসের দাম। গ্রামে সারাদিনে দু-একবার বিদ্যুতের দেখা না মিললেও বিদ্যুৎ সচিব বলবেন, 'বর্তমানে দেশে লোডশেডিং নাই'। সুন্দরবন নিয়ে এত যুক্তি, এত কথা কানে তোলেনি সরকার। এখানেও গায়ের জোরই শেষ কথা।

অর্থনীতিতে যে লুটপাট ও কর্তৃত্ব চলছে, রাজনীতি-সংস্কৃতিসহ সমাজজীবনের সর্বত্র তারই ছাপ। গণতান্ত্রিক আচরণ-মূল্যবোধ নির্বাসিত প্রায়। উঁচু স্তরের ক্ষমতার দম্ভ নিচের স্তরেও একইভাবে প্রকাশিত হচ্ছে। গত কিছুদিন আগে চট্টগ্রামে ছাত্রলীগের নগর সভাপতি নুরুল আযম রনি ২০ লক্ষ টাকা চাঁদার জন্য কলেজের এক অধ্যক্ষ ও একজন কোচিং ব্যবসায়ীকে বেদম পিটিয়েও বহাল তবিয়তে আছেন। মামলা হয়েছে কিন্তু আসামী খুঁজে পাচ্ছে না পুলিশ! কোটা সংস্কার আন্দোলনের সময় আন্দোলনকারী শিক্ষার্থীদের উপর নির্যাতনকারী ছাত্রলীগ নেত্রী পরবর্তীতে বরমাল্য পেয়েছে স্বয়ং আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদকের হাতে। কুকর্মের দায় এড়াতে রাতারাতি বহিষ্কারাদেশ দিন কয়েক পরেই সাংগঠনিক দায়িত্ব পালনের স্বীকৃতি স্বরূপ তুলে নিয়েছে ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় কমিটি। প্রকাশ্যে অপরাধীর পক্ষাবলম্বনে এতটুকু কুণ্ঠা নেই! অধঃপতিত রাজনীতির বলয়ে তারুণ্যের শক্তি কীভাবে নিঃশেষিত হয় – ঘটনা দুটি তারই সাক্ষ্য বহন করছে।

তারুণ্যের শক্তিক্ষয়ের আরো নমুনা আছে। সম্প্রতি চট্টগ্রামে তাসফিয়া নামের এক কিশোরী তারই ফেসবুক বন্ধু আদনান ও তার বন্ধুদের দ্বারা ধর্ষিত হবার পর খুন হলো। ভোগবাদী এ সমাজে প্রবৃত্তির প্রবল তাড়নায় মানুষের মানবিক চেতনা কীভাবে লুপ্ত হয়ে যায় – দেখে গা শিউরে ওঠে। বাসের মধ্যে ধর্ষণ চেষ্টার কয়েকটি ঘটনাও এসময় ঘটেছে।

আরও কয়েকটি খবর দেখা যাক। ভর্তি ফরমের দুই কোটি টাকার ভাগ বাটোয়ারা নিয়ে রংপুরে বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি ও শিক্ষকদের মধ্যে দ্বন্দ্ব। (বাংলা ট্রিবিউন, ২৮ এপ্রিল '১৮) নীলফামারীর কিশোরগঞ্জে দুই দিনের মাথায় সড়কের কার্পেটিং উঠে গেছে। (ইত্তেফাক, ২৭ এপ্রিল) ইত্যাদি। প্রতিদিন হত্যা-খুনের যত খবর পত্রিকায় আসে, তার বিবেচনায় এগুলো নগণ্য। আমরাও এভাবে দেখি-ভাবি বলেই ছোট ছোট অন্যায় ন্যায্যতা পেতে পেতে বড় ঘটনাতেও সংবেদন হারিয়ে ফেলি।

এই সমাজে শিক্ষকের নেই নৈতিকতার পরোয়া, যুবক-তরুণদের নেই বিবেকের পয়োয়া, পেশাজীবীর নেই দায়িত্ববোধের পরোয়া, সরকারের নেই জনগণের পরোয়া! কেন নেই? জাতীয় ও বৈশ্বিক প্রেক্ষাপট দেখলে এটাই দেখবো – যেখানে পুঁজির দাপট, লাভ-মুনাফার উদগ্র লোভ, সেখানে মানুষের পরোয়া থাকে না। অর্থনীতিতে কর্তৃত্ব, রাজনীতিতে ক্ষমতার একচ্ছত্র দাপট, কুক্ষিগত আইন-বিচার ব্যবস্থা, সংস্কৃতিতে ভয়-ভীতি অথবা 'কিছু হবে না' মনোভাব – ফ্যাসিবাদের এই ভয়ঙ্কর জমিন অতীতের সব সংগ্রামের ফসলকে চিটায় পরিণত করেছে। পাল্টা রাজনৈতিক সংগ্রামের প্রচেষ্টা ছাড়া এ থেকে উত্তরণের কোনো পথ আছে কি?

পিইসি বাতিল ও প্রশ্নফাঁস বন্ধ করুন

(১ম পৃষ্ঠার পর) প্রকোপ। অন্যদিকে প্রশ্নপত্র ফাঁস দেখা দিয়েছে সামাজিক ব্যাধি রূপে। প্রাথমিক থেকে যেকোনো চাকুরির পরীক্ষায় প্রশ্নপত্র ফাঁস এখন এক অনিবার্য ব্যাপার। সাধারণ মানুষ আতঙ্কিত – আগামী দিনে কোন ভবিষ্যৎ তাদের জন্য অপেক্ষা করছে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অপরাজেয় বাংলার পাদদেশে সকাল সাড়ে এগারটায় কর্মসূচি শুরু হয়। প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের পরও বেলা দেড়টা পর্যন্ত সমাবেশ ও মিছিলের কাজ চলে। সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন সংগঠনের কেন্দ্রীয় সভাপতি নাঈমা খালেদ মনিকা। বক্তব্য রাখেন নারায়ণগঞ্জ বেইলি স্কুলের অধ্যক্ষ মঞ্জুরুল হক, অভিভাবক মাহমুদুল হক আরিফ, সাংগঠনিক সম্পাদক মাসুদ রানা। পরিচালনা করেন দপ্তর সম্পাদক রাশেদ শাহরিয়ার।

সমাবেশ থেকে বক্তারা বলেন, 'ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে অভিভাবকরা আন্দোলনে নামার প্রেক্ষিতে ২০১৬ সালে পিইসি পরীক্ষা বাতিলের ঘোষণা দেয়া হলো। কিন্তু বাতিল করা হলো না। স্কুলে ফাইনাল পরীক্ষা চালু থাকার পরও এ পরীক্ষার কোনো প্রয়োজন আছে কি? এরকম কোনো প্রয়োজন জনগণ-শিক্ষার্থীদের না থাকলেও সরকারের আছে। তাদের প্রধান উদ্দেশ্য শিক্ষাব্যবসাকে ত্বরান্বিত করা। এর জন্য যদি কোমলমতি শিশুদের শৈশব ধ্বংসও করতে হয়, তাতে কিছু যায় আসে না। এ পরীক্ষা এমনই মানসিক চাপ তৈরি করেছে যে গতবছর কয়েকটি শিশু আত্মহত্যা পর্যন্ত করেছে।

সংবাদমাধ্যমে এসেছে, হাজার হাজার কোচিং সেন্টার গড়ে উঠেছে যাদের বছরে মুনাফা প্রায় ৫০ হাজার কোটি টাকা, বাজারে চলছে গাইড বইয়ের রমরমা ব্যবসা। সৃজনশীলতার নামে মুখস্ত নির্ভরতা বেড়েছে। এছাড়াও আমাদের দেশের শিক্ষা ব্যবস্থার ধরন, ছাত্র-শিক্ষক অনুপাত, অপর্যাপ্ত অবকাঠামো, অপ্রতুল আয়োজন, প্রশিক্ষণের দুর্বলতা বিবেচনায় না নিয়ে একের পর এক নতুন নতুন নিয়ম শিক্ষার্থীদের উপর চাপিয়ে দেয়া হচ্ছে। এই অবস্থায় শুধু পাবলিক পরীক্ষার নামে পিইসি একটি সার্টিফিকেট ছাড়া আর কিছুই দিতে পারেনি। এই পরীক্ষা বাতিল না হওয়া পর্যন্ত ছাত্র ফ্রন্টকে লড়াই চালিয়ে যেতে হবে।'

বক্তরা আরও বলেন, 'সর্বশেষ এসএসসি পরীক্ষায় সবগুলো বিষয়েই প্রশ্নপত্র ফাঁস হয়েছে। প্রশ্নপত্র নিয়ে কোটি কোটি টাকার ব্যবসা হচ্ছে। অথচ শিক্ষামন্ত্রীসহ শিক্ষাসংশ্লিষ্ট কেউই দায় স্বীকার করেননি, ব্যবস্থাও নেননি। যারা এই প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে, তাদেরও বা ভবিষ্যৎ কী? এরাই তো একদিন ডাক্তার-ইঞ্জিনিয়ার হবে, দেশের শাসনকর্তা হবে? তাদের হাতে কোন বাংলাদেশ অপেক্ষা করছে? এই সরকার, তার দলীয় প্রশাসনই শিশু-কিশোরসহ শিক্ষার্থীদের ক্রিমিনাল বানাচ্ছে। এ অপচেষ্টা এখনই বন্ধ করতে হবে।"

সমাবেশ শেষে কেন্দ্রীয় সভাপতি নাঈমা খালেদ মনিকার নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধি দল প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রী মোস্তাফিজুর রহমান ফিজারের সাথে দেখা করে স্মারকলিপি প্রদান করেন।

সংকল্পে, সংগ্রামে, মানবিকতায় কার্ল মার্কসকে স্মরণ

(১ম পৃষ্ঠার পর) এই সমস্ত জ্ঞানকে একসাথে করে তিনি তাঁর তত্ত্ব তৈরি করেছিলেন এবং সকলকে ছাড়িয়ে গেছেন। তাঁর কালে তিনি শ্রেষ্ঠ চিন্তাবিদ ছিলেন। কিন্তু সেটাই একমাত্র পরিচয় নয়। এঙ্গেলস বলছেন যে, তাঁর আরেকটা পরিচয় এবং সেটাই প্রধান পরিচয় যে, মার্কস ছিলেন আগাগোড়া বিপ্লবী। তিনি মহৎ একারণে যে, তিনি সবসময়েই বিপ্লবী এবং তাঁর জীবনের সাধনাই ছিল বিপ্লবের সাধনা। তাই এই দু'টো জিনিস একসাথে মিলেছে। একদিকে বৈজ্ঞানিক চিন্তা, দার্শনিক চিন্তা এবং আরেকদিকে বিপ্লবের পক্ষে কাজ করা – এই দুই সমন্বয় দর্শনের ইতিহাসে খুব বিরল ঘটনা। তিনি একদিকে তত্ত্ব দিচ্ছেন, আরেকদিকে সংগ্রাম করছেন এবং সেই সংগ্রামের মধ্য দিয়ে তিনি বিপ্লবকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন।

মার্কস তাঁর মেয়ে লরার খাতাতে কতগুলো প্রশ্নের উত্তর দিয়েছিলেন তাঁর নিজের সম্বন্ধে। এই খাতার মধ্যে (নোটবুক, ১৯৬০ এর দশকে প্রকাশিত) তিনি কয়েকটি প্রশ্নের জবাব দিয়েছিলেন। সেটা দেখলেই বোঝা যাবে তিনি শুধু একজন দার্শনিক বা বিজ্ঞানী নন, তিনি একজন স্নেহময় পিতা, একজন মানবিক মানুষও। তিনি নিজের যে গুণটিকে সবচেয়ে বড় বলে মনে করতেন তা হলো তাঁর সরলতা। মানুষের যে গুণটিকে তিনি সবচেয়ে বড় বলে মনে করতেন তা হলো তাদের শক্তি। লড়াই করাটা তাঁর কাছে ছিল সুখের। একারণে এঙ্গেলস তাঁর সম্পর্কে বলেছেন, 'মার্কসের মধ্যে আছে আবেগ, আছে সৃজনশীলতা।'

মার্কস দেখিয়েছেন, বস্তু থেকেই মনের সৃষ্টি। আবার বস্তু ও মনের পারস্পরিক সম্পর্ক একরৈখিক নয়, দ্বান্দ্বিক। এই দ্বন্দ্বের তত্ত্বটি তিনি পেয়েছিলেন হেগেলের কাছ থেকে। সেটাকে তিনি বস্তুজগৎ ব্যাখ্যা করতে কাজে লাগালেন, সমাজ ও ইতিহাসকে বিশ্লেষণ করলেন। শ্রেণিসংগ্রামের তত্ত্ব আবিষ্কার করে দেখালেন পরস্পরবিরোধী শ্রেণির দ্বন্দ্বের কারণে সমাজ পরিবর্তিত হয়। এই পুঁজিবাদী সমাজও ভাঙবে। ভাঙবে দুই কারণে– একটা হচ্ছে বৈজ্ঞানিক কারণ, আরেকটা হচ্ছে মানবিক কারণ। বৈজ্ঞানিক কারণটা হচ্ছে– এই যে উৎপাদনের যে বিশাল শক্তি, যে শক্তি শ্রমিকের আছে, যে শক্তি মানুষের সৃজনশীলতার মধ্যে আছে, সেই শক্তি ব্যক্তিগত মালিকানার যাঁতাকলের মধ্যে আবদ্ধ হয়েছে। এটা টিকবে না, এটা টিকতে পারে না। অতীতের সভ্যতাগুলো ভেঙে পড়েছে এই দ্বন্দ্বের কারণে, সামন্তবাদ ভেঙেছে, পুঁজিবাদ এসেছে। তার আগে দাসপ্রথা ভেঙেছে, এই সমাজও ভাঙবে – এটা একটা বৈজ্ঞানিক কারণ। এই বিপুল শক্তি এইখানে আটকা পড়ে থাকবে না। দ্বিতীয় কারণ মানবিক। এই মেহনতি মানুষরা বঞ্চিত। তাদের জীবন দুর্বিষহ, পশুর মতো। সেই মানুষ বঞ্চনাকে সহ্য করবে না, ফলে এই ব্যবস্থা মানবিক কারণেও ভাঙবে।"

উপমহাদেশে বামপন্থী আন্দোলন কেন গড়ে উঠল না – এ সম্পর্কে বলতে গিয়ে অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী কয়েকটি বিষয়ে আলোকপাত করেন। তিনি বলেন, "এখানে কমিউনিস্ট পার্টিগুলো বরাবরই রাষ্ট্রশক্তির ভয়াবহ নিষ্পেষণের মধ্যে পড়েছে। নিষিদ্ধ হয়ে যাওয়া, কারাভোগ করা ইত্যাদি নিয়মিত চিত্র ছিল। অপরদিকে দলগুলোর মধ্যে পেটিবুর্জোয়া প্রবণতা অর্থাৎ অস্থিরতা, দ্রুত সাফল্য না আসলে হতাশ হয়ে যাওয়া – এই প্রবণতা বিদ্যমান ছিল। তারা নিজেদের দেশ সম্পর্কেও সঠিক বিশ্লেষণ দাঁড় করাতে পারেননি। মস্কো কিংবা পিকিংয়ের মুখাপেক্ষী হয়ে থেকেছেন। তারা কৃষকের বিশেষ ভূমিকা ধরতে পারেননি। ফলে একদিকে রাষ্ট্রীয় নিষ্পেষণ, অন্যদিকে পেটিবুর্জোয়া প্রবণতা – এখানে কমিউনিস্ট আন্দোলন দাঁড়াতে দেয়নি। আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো – এখানে কমিউনিস্ট পার্টি জাতি সমস্যার কোনো সমাধান করতে পারেনি।

এখানে কমিউনিস্টরা ধর্মনিরপেক্ষতার কথা সঠিকভাবে বলতে পারেনি। অথচ কমিউনিজমের প্রথম কথাই হচ্ছে ধর্মনিরপেক্ষতা। মৌলবাদের সাথে পুঁজিবাদের কোনো দ্বন্দ্ব নেই। সকল মৌলবাদীই পুঁজিবাদী। তাদের মধ্যে মাঝে মধ্যে যে দ্বন্দ্ব দেখা যায়, তা হলো ভাইয়ে ভাইয়ে দ্বন্দ্ব।"

তিনি বলেন, "পুঁজিবাদী শোষণে বিশ্বের পরিস্থিতি এবং দেশের পরিস্থিতি কী আজ সবাই জানেন। অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী পরিবারও আজ ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে, কোনো ভবিষ্যৎ কেউ দেখতে পারছে না, চারিদিকে এক আঁধার নেমে এসেছে। এই ভয়াবহ পরিস্থিতি থেকে উত্তরণ ঘটাতে হলে সমাজতন্ত্র ছাড়া অন্য কোনো রাস্তা নেই।"

কমরেড মুবিনুল হায়দার চৌধুরী তাঁর বক্তব্যে বলেন, "মার্কস প্রথম দিকে হেগেলের চিন্তার অনুসারী ছিলেন। হেগেলের চিন্তা নিয়ে তর্ক করতে করতে হেগেলেরই শিষ্যরা এরপর দুইভাগে ভাগ হয়ে যায়। একদল হেগেলের সমর্থক, আরেকদল হেগেলের সমালোচক। হেগেলের সমালোচনাকারীরা ফুয়েরবাখের নেতৃত্বে লেফ্‌ট হেগেলিয়ান নামে পরিচিত ছিল। মার্কস লেফ্‌ট হেগেলিয়ানদের সাথে যুক্ত হন। কার্ল মার্কস কীভাবে ফুয়েরবাখেরও সীমাবদ্ধতা ধরতে পেরেছিলেন এবং তাঁকে অতিক্রম করে দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদের ভিত্তি স্থাপন করেছিলেন, বিশিষ্ট মার্কসবাদী দার্শনিক ও চিন্তাবিদ কমরেড শিবদাস ঘোষের শিক্ষার ভিত্তিতে এ সম্পর্কে আমি আপনাদের কিছু বলব।

হেগেল ভাববাদী দার্শনিকদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ছিলেন। তিনি দ্বন্দ্বতত্ত্বের মূল সূত্রগুলি আবিষ্কার করেন। হেগেল এগুলো ভাববাদী ঢঙে বিশ্লেষণ করেছেন নিছক চিন্তার সূত্র হিসেবে। মার্কস এই নিয়মগুলোকে দেখালেন যে নিয়মগুলো বিশ্বজনীন, বিজ্ঞানের প্রতিটি ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। হেগেলের সীমাবদ্ধতার আরেকটি দিক ছিল এই যে, তিনি ধরে নিলেন যে, একটা শাশ্বত ভাব এই জগতের স্রষ্টা। বস্তুজগৎ হলো সেই অ্যাবসোলিউট আইডিয়ার ডায়ালেকটিক্যাল এক্সপ্রেশন। কথা উঠল, আইডিয়া যদি অ্যাবসোলিউট হয় তবে এক্সপ্রেশন ডায়ালেকটিক্যাল হয় কী করে? আবার এক্সপ্রেশন যদি ডায়ালেকটিক্যাল হয় তবে আইডিয়া অ্যাবসোলিউট হয় কী করে?

ফুয়েরবাখ হেগেলের এবসোলিউট আইডিয়াকে বাদ দিতে বললেন। তিনি মন ও বস্তুর মধ্যে বস্তুই যে আগে, বস্তুকে কেন্দ্র করেই যে মনের সৃষ্টি হয় – সেটা ধরতে পেরেছিলেন। কিন্তু বস্তু ও মনের মধ্যে দ্বান্দ্বিক সম্পর্ককে তিনি ধরতে পারেননি। ফলে নীতি-নৈতিকতা-মূল্যবোধ ইত্যাদিকে তিনি শাশ্বত ধরে নিলেন।

এই পটভূমিকায় এলেন মার্কস। মার্কস হেগেলের যুক্তিকে খণ্ডন করে দেখালেন যে, বাস্তব জগৎ শাশ্বত ভাবের দ্বন্দ্বমূলক প্রকাশ নয়, বরং বাস্তব জগৎ মানব মস্তিষ্কে প্রতিফলিত হয়ে চিন্তায় রূপান্তরিত হচ্ছে এবং সেটাই ভাব।

মার্কসবাদ সৃষ্টি হয়েছে ইংল্যান্ডের ক্ল্যাসিকাল অর্থনীতি, ফরাসি সমাজতন্ত্র ও জার্মান দর্শনের উৎপত্তির উপর ভিত্তি করে; আবার বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে ডারউইনের বিবর্তনবাদ, ভরের সংরক্ষণশীলতার সূত্র এবং কোষতত্ত্ব আবিষ্কারের ফলে দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ আসার ভিত্তি স্থাপিত হয়। মার্কসের আগে প্রত্যেক দার্শনিকই মানুষের জন্য ভেবেছেন, মানুষের কল্যাণের জন্য চেষ্টা করেছেন, কিন্তু তাদের সমস্ত চিন্তাপ্রক্রিয়া ব্যক্তিমানসকে কেন্দ্র করে ছিল, অর্থাৎ চিন্তাপ্রক্রিয়া ছিল সাবজেকটিভ। মার্কসই প্রথম সত্য নির্ণয়ের ক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও অনুসন্ধানকে ভিত্তি করলেন।

শ্রেণিসংগ্রামই সমাজের পরিবর্তনের জন্য নিয়ামক হিসেবে কাজ করে। মার্কস দেখালেন, আজ পর্যন্ত সকল লিখিত ইতিহাসই হচ্ছে শ্রেণিসংগ্রামের ইতিহাস। পরিবর্তনের নিয়মে এই পুঁজিবাদী ব্যবস্থাও একদিন পরিবর্তিত হবে। সমাজতন্ত্র আসবে। সমাজতন্ত্র হলো একটা অন্তবর্তীকালীন ব্যবস্থা। সমাজতন্ত্র থেকে যে পুঁজিবাদে পশ্চাদপসরণ হতে পারে – এ ব্যাপারে মার্কসই সতর্ক করে গেছেন। পুঁজিবাদের গর্ভেই সমাজতন্ত্রের জন্ম হয় বলে সে অর্থনৈতিক, নৈতিক ও বুদ্ধিগত – সকল ক্ষেত্রেই জন্মচিহ্ন বহন করে।"

কমরেড মুবিনুল হায়দার চৌধুরী প্রথম আন্তর্জাতিক গড়ে ওঠা ও সেখানে মার্কসের ভূমিকা নিয়ে আলোচনা করেন। মার্কস প্রবল দুঃখ-কষ্টের মধ্যে তাঁর জীবন পরিচালনা করেছেন, কিন্তু লড়াই থেকে এক পা-ও পিছনে আসেননি। মার্কসের এই জীবনসংগ্রামকে কমরেড মুবিনুল হায়দার তুলে ধরেন। সেখানে তাঁর বন্ধু, সর্বহারার আরেক মহান নেতা এঙ্গেলস ও মার্কসের স্ত্রী জেনি মার্কসের ভূমিকা নিয়ে তিনি আলোচনা করেন। মার্কসের জীবনে জ্ঞানচর্চা, সংগঠন ও মানবিকতার যে সমন্বয় ঘটেছে– এটা সচরাচর কোনো মানুষের জীবনে ঘটে না।

কমরেড মুবিনুল হায়দার চৌধুরী দেশের সাম্প্রতিক পরিস্থিতি বর্ণনা করে দেখান যে, "দেশে আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে এক চরম ফ্যাসিবাদী সরকার দেশ পরিচালনা করছে। দেশের বামপন্থী দলগুলোর উচিত ছিল এ সময়ে জনগণের বিভিন্ন দাবি-দাওয়াকে কেন্দ্র করে তীব্র গণআন্দোলন গড়ে তোলা। কিন্তু দুঃখের বিষয়, বামপন্থী দলগুলোর অনেকেই আজ ক্ষমতার যাওয়ার জন্য নির্বাচনী রাজনীতিতেই জড়িয়ে পড়েছেন। নির্বাচনকে উদ্দেশ্য করেই সমস্ত কর্মকাণ্ড পরিচালনা করছেন, অথচ আবার মুখে তারা বিপ্লবের কথাও বলছেন। এ অবস্থা চলতে পারে না। যত ক্ষুদ্র শক্তিই হোক না কেন, বামপন্থীদের গণআন্দোলন গড়ে তোলার উদ্যোগ নিতে হবে, তা না হলে এই ভয়াবহ দুঃখ ঘুচবে না।"

আলোচনাসভা সভাপতিত্ব করেন বাসদ (মার্কসবাদী) কেন্দ্রীয় কার্যপরিচালনা কমিটির সদস্য কমরেড শুভ্রাংশু চক্রবর্ত্তী এবং পরিচালনা করেন কমরেড আলমগীর হোসেন দুলাল। সভাশেষে মার্কসকে নিয়ে লেখা একটি সংগীত পরিবেশন করেন চারণ সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের শিল্পীরা। কমিউনিস্ট ইন্টারন্যাশনাল পরিবেশনের মধ্য দিয়ে সভার কাজ শেষ হয়।

বীরেন চন্দ্র শীলসহ সকল গ্রেপ্তারকৃত আন্দোলনকারীদের মুক্তির দাবি

গাইবান্ধার সুন্দরগঞ্জে 'আবাদি জমি ও বাস্তুভিটা রক্ষা সংগ্রাম কমিটি'র উপদেষ্টা, বাসদ(মার্কসবাদী) সুন্দরগঞ্জ উপজেলা শাখার আহ্বায়ক বীরেন চন্দ্র শীলসহ গ্রেপ্তারকৃত ১০ জন আন্দোলনকারীর মুক্তি ও মিথ্যা মামলা প্রত্যাহারের দাবি জানিয়েছে বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল (মার্কসবাদী)। আন্দোলনকারীদের উপর শাসকদের দমন-পীড়নের প্রতিবাদে দেশব্যাপী বিক্ষোভ মিছিল-সমাবেশ হয়েছে। ঢাকায় গত ৯ মে জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে কেন্দ্রীয়ভাবে বিক্ষোভ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়। কর্মসূচিতে বক্তব্য রাখেন দলের কেন্দ্রীয় কার্যপরিচালনা কমিটির সদস্য আলমগীর হোসেন দুলাল, মানস নন্দী, উজ্জ্বল রায়, ফখরুদ্দিন কবির আতিক, সাইফুজ্জামান সাকন।

নেতৃবৃন্দ জবরদস্তি ও জালিয়াতি বন্ধ করে স্থানীয় জনসাধারণের সাথে আলোচনা সাপেক্ষে তাদের সম্মতি নিয়ে অকৃষিজমিতে প্রস্তাবিত সৌরবিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণের দাবি জানান।

তাঁরা বলেন, "দেশের শীর্ষ ঋণখেলাপি ও শেয়ার বাজার জালিয়াতিতে অভিযুক্ত সালমান এফ রহমানের মালিকানাধীন বেক্সিমকো কোম্পানি সুন্দরগঞ্জের তারাপুর ইউনিয়নে ২০০ মেগাওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন 'তিস্তা সোলারপ্ল্যান্ট' নামে একটি সৌর বিদ্যুৎকেন্দ্র স্থাপন করতে সরকারের সাথে চুক্তিবদ্ধ হয়েছে। চুক্তির শর্তানুযায়ী বাস্তুভিটা ও আবাদি জমি নষ্ট করে বিদ্যুৎকেন্দ্র করা যাবে না এবং বিদ্যুৎকেন্দ্রের স্থান হবে লাঠশালার চরে। অথচ শর্ত ভঙ্গ করে কোম্পানি নানা ষড়যন্ত্র এবং ভয়-ভীতি দেখিয়ে এলাকার মানুষকে তাদের বাপ-দাদার বসতভিটা ও আবাদি জমি থেকে উচ্ছেদ করছে। এমনকি তারা পার্শ্ববর্তী মৌজা চর খোর্দ্দার মানুষকেও উচ্ছেদ করার ষড়যন্ত্র করছে, যেটি একটি জনবহুল ও উর্বর কৃষিজমির এলাকা। কোম্পানির বে-আইনী কর্মকাণ্ডের প্রতিবাদে এলাকাবাসী 'বাস্তুভিটা ও আবাদি জমি রক্ষা সংগ্রাম কমিটি'র ব্যানারে প্রতিবাদ করে আসছিল। তারা ইউএনও, জেলা প্রশাসক এবং বিভাগীয় কমিশনার বরাবর স্মারকলিপি প্রদান করেছে।

কিন্তু প্রশাসন লুটেরা সালমান এফ রহমানের কোম্পানির বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা নেয়নি। উল্টো প্রতিবাদ করার কারণে পুলিশ সাধারণ মানুষের উপর গুলি চালিয়েছে, গুলিবিদ্ধ হয়েছে ১০ জন। পুলিশ এবং কোম্পানি কর্তৃপক্ষ আন্দোলনকারীদের নামে ৩টি মিথ্যা মামলা দায়ের করেছে। যে মামলাগুলোতে নাম উল্লেখ করে শতাধিক এবং অজ্ঞাতনামা ১ হাজার ২শ জনকে আসামী করা হয়েছে। মিথ্যা মামলায় আদালতে জামিন নিতে গেলে গত ৮ মে বাসদ (মার্কসবাদী) সুন্দরগঞ্জ উপজেলার আহ্বায়ক বীরেন চন্দ্র শীলসহ আন্দোলনকারী রুপিয়া বেগম, আরজিনা বেগম, মুক্তি বেগম, শরফুন্নেছা, রেজাউল, রাজ্জাক, বাদশা, শাহজাহান, আকরাম মণ্ডলকে জামিন না দিয়ে গ্রেপ্তার দেখানো হয়েছে। এদের মধ্যে একজন প্রতিবন্ধী, ৪ জন মহিলা, একজন মহিলার সঙ্গে ৬ মাসের শিশু, অন্যজনের সঙ্গে ১ বছরের শিশু।"

নেতৃবৃন্দ গাইবান্ধার সিভিল প্রশাসনের নির্বিকার ভূমিকা ও পুলিশ প্রশাসন কর্তৃক বেক্সিমকো কোম্পানির লাঠিয়াল হিসেবে ভূমিকা পালনের তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানান।

দেশব্যাপী মহান মে দিবস পালন

চাঁদপুর

নোয়াখালি

বগুড়া

সিলেট

চট্টগ্রাম

রংপুর

মার্কিন মদদে নাটক সাজায় জঙ্গিরা

(শেষ পৃষ্ঠার পর) বিশেষজ্ঞ প্রতিবেদক রবার্ট ফিস্ক। ঘুরে ঘুরে কথা বলেন, হাসপাতাল ক্লিনিকসহ প্রত্যক্ষদর্শীদের সাথে। তুলে আনেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মদদপুষ্ট ইসলামী জঙ্গীগোষ্ঠী আল কায়েদা ও হোয়াইট হেলমেটের সাজানো নাটকের বিশদ বিবরণ। তাঁর অনুসন্ধানী প্রতিবেদন ফাঁস করে দিয়েছে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের ভয়ঙ্কর প্রতারণা আর মিথ্যাচার।

ইঙ্গ-মার্কিন সাজানো নাটক

সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে হঠাৎ ছড়িয়ে পরে সিরিয়ার আল কায়েদা নিয়ন্ত্রিত গৌতা শহরে রাসায়নিক অস্ত্র হামলায় আক্রান্ত শিশুদের ছবি। ভিডিওতে দেখা যায়, হাসপাতালে শ্বাস-প্রশ্বাস নিতে না পারছে না বেশ কিছু শিশু, কিছু লোক তাদের মাথায় পানি ঢালছে। আল কায়েদার হাত থেকে দখল নিতে সাধারণ মানুষের ওপর রাসায়নিক অস্ত্র হামলা চালিয়েছে আসাদ সরকারের সেনাবাহিনী। সেসব ছবি লুফে নিয়ে শত শত সংবাদ তুলে ধরে আন্তর্জাতিক প্রভাবশালী সংবাদ মাধ্যমগুলো। যেখানে ছবিগুলোর সত্যতা খতিয়ে দেখার প্রয়োজন বোধ করেনি তারা।

৭ এপ্রিল দৌমায় কী ঘটেছিল?

"অন্য দিনের মতোই দৌমার আকাশে সিরিয়ার সেনাবাহিনীর বিমান ঘোরাঘুরি করছিল। গোলাবর্ষণও চলছিল। তবে সেই রাতে প্রচণ্ড বাতাস বইছিল। অনেকটা ঝোড়ো বাতাসে প্রচুর ধুলোবালি ঢুকে পড়েছিল মাটির নিচের সাধারণ মানুষের থাকার ঘরগুলোতে। অনেকেই হাইপোক্সিা বা অক্সিজেনের অভাবজনিত সমস্যায় ক্লিনিকে এসেছিল। হঠাৎ করেই দরজার কাছে দাঁড়িয়ে 'হোয়াইট হেলমেট' গোষ্ঠীর এক সদস্য চিৎকার করে উঠল 'রাসায়নিক গ্যাস' বলে। আর সাথে সাথে আতঙ্ক ছড়িয়ে গেল। অক্সিজেনের সমস্যায় ভোগা মানুষগুলো দ্রুত একজন আরেকজনের মাথায় পানি ঢালতে শুরু করল। শিশুদের মাথায় পানি ঢালা হলো এবং এই ক্লিনিকেই ভিডিও ছবিগুলো তোলা হয়েছিল। শিশুসহ ছবির লোকগুলো আক্রান্ত হয়েছিল রাসায়নিক গ্যাসে, কষ্ট পাচ্ছিলেন অক্সিজেন ঘাটতিতে। এটা ক্লিনিকের ডাক্তারসহ সকলেই জানে।" এভাবের রবার্ট ফিস্ক - এর কাছে সে রাতের প্রকৃত ঘটনা বর্ণনা করছিলেন দৌমার ঐ ক্লিনিকের ডাক্তার আসিম রাহাইবানি। প্রত্যক্ষদর্শী সেই ডাক্তারের বক্তব্য হুবহু ইন্ডিপেনডেন্ড পত্রিকায় তুলে ধরেন রবার্ট ফিস্ক। গ্যাসের কারণে শিশুদের মৃত্যুর মিথ্যা প্রচারণা চালানোর গুমোর ফাঁস করেন তিনি।

অথচ বিশ্ব সন্ত্রাসের মোড়ল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ৮ এপ্রিল টুইটারে লিখেন, "মৃতের সংখ্যা অসংখ্য, শিশু ও নারীরাও রয়েছে। সাধারণ মানুষের উপর বর্বরোচিত রাসায়নিক হামলা চালিয়েছে সিরিয়ার সেনাবাহিনী। রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট পুতিন ও ইরান দায়ী পশু আসাদকে সহযোগিতা করছে।" একটি স্বাধীন দেশের প্রেসিডেন্টকে 'পশু' বলার ধৃষ্টতা দেখিয়েছে ট্রাম্প। এই প্রোপাগান্ডা চালিয়েই সিরিয়ায় ১০৫ টি মিসাইল হামলার ক্ষেত্র প্রস্তুত করেছিল ট্রাম্প প্রশাসন। থলের বেড়াল বেড়িয়ে আসা রুখতে আন্তর্জাতিক রাসায়নিক অস্ত্র নিষিদ্ধকরণ সংস্থা 'ওপিসিডব্লিউ'র কার্যক্রমকে বাধাগ্রস্ত করার চেষ্টা করেছিল। সিরিয়ার আহ্বানে সাড়া দিয়ে সংস্থাটি যখন দৌমা শহরে যাওয়া ঠিক করে সেই মুর্হুতে মিসাইল হামলা চালিয়ে প্রমাণ মুছে ফেলতে চেয়েছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত অনুসন্ধানী সাংবাদিকতার মাধ্যমে ঠিকই বেড়িয়ে এসেছে আসল সত্য। সাম্রাজ্যবাদী মিডিয়াগুলো চেপে যাওয়ার মতো বাংলাদেশের গণমাধ্যমগুলোও রবার্ট ফিস্ক -এর 'অনুসন্ধানী সেই প্রতিবেদন' প্রকাশ করেনি। অথচ সিরিয়ার কথিত রাসায়নিক হামলায় আক্রান্ত শিশুদের ওপর দিনে-রাতে অসংখ্য প্রতিবেদন করেছিল দেশের সকল মিডিয়া। তাইতো সিরিয়ায় মিসাইল হামলার প্রতিবাদে বাসদ (মার্কসবাদী)র প্রতিবাদ সমাবেশের খবরও স্থান পায়নি পত্রিকার পাতায়।

সম্প্রতি স্কাই টেলিভিশন সাক্ষাৎকারে সিরিয়ার প্রেসিডেন্ট বাশার আল আসাদ জানান, "নুসরা ফ্রন্টে কথিত সেই গ্যাস অ্যাটাকের বিষয়ে আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমগুলো অনুসন্ধান না করেই ভুয়া সংবাদ ছেপেছে। কোনো ধরনের প্রমাণ ছাড়াই বিকৃত তথ্য সম্প্রচার করা হয়েছে উদ্দেশ্যমূলকভাবে। যে অঞ্চলটির সংবাদ প্রকাশ করা হয়েছে তা নিয়ন্ত্রণ করত আল কায়েদা সিরিয়া শাখা। ফলে আল কায়েদার ভুয়া ভিডিওসহ তথ্যগুলোই প্রচারিত হয়েছে। এ জন্যই আমরাই উদ্যোগী হয়ে আন্তর্জাতিক তদন্ত দলকে আহ্বান করেছি।"

গেল সাত বছরে আইএস নির্মূলে সিরিয়া-রাশিয়ান যৌথ অভিযানে শুধু দৌমা শহরই বাকী ছিল। পূর্ব ঘৌতার পাহাড়ি এলাকা জঙ্গীমুক্ত করার পাশাপাশি 'মানব করিডর' করে আটকে পড়া দেড় লাখ সাধারণ মানুষকে বেরিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করেছিল। এমনকি কথিত রাসায়নিক হামলার আগের দিন দেশটির বিমান বাহিনী আরেক সন্ত্রাসী গোষ্ঠী 'জয়েশ আল ইসলাম'র ৩০০ -এর বেশি ঘাঁটি ও অস্ত্র ভাণ্ডার ধ্বংস করেছে। জঙ্গী সন্ত্রাসীদের যোগাযোগ দপ্তরও গুড়িয়ে দিয়ে শহরটি মুক্ত করার দ্বারপ্রান্তে যখন আসাদ সরকার, তখনই সন্ত্রাসীদের মদদ দিতে এই সাজানো নাটক করেছে যুক্তরাষ্ট্র। টেলিভিশন সাক্ষাৎকারে প্রেসিডেন্ট আসাদ আরও বলেন, "আমরা যখন আল কায়েদাসহ সন্ত্রাসীদের হাত থেকে প্রায় সবগুলো শহর মুক্ত করেছি তখন কেন আমরা রাসায়নিক অস্ত্রের হামলা চালাব? আর আমরা নৈতিকভাবে সমর্থন করি না এধরনের অস্ত্রের ব্যবহার। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আল কায়েদাসহ সন্ত্রাসী জঙ্গীগোষ্ঠীকে পোষে ও মদদ দেয়। আর এই কারণে কথিত রাসায়নিক হামলার ভুয়া সংবাদ প্রচার করেছে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমসহ গণমাধ্যমে।...এর চেয়ে নিন্দাজনক ঘটনা আর কী হতে পারে?"

নারী-শিশু নির্যাতনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে সোচ্চার হোন

রবীন্দ্রনাথের একটি কবিতার লাইন আছে – 'অন্যায় যে করে আর অন্যায় যে সহে, তব ঘৃণা যেন তারে তৃণসম দহে'। প্রতিদিন নারী নির্যাতনের অসংখ্য ঘটনা আমাদের গা সওয়া হয়ে যাচ্ছে। কেবল নারী নির্যাতকের কারণে নয়, আমাদের নিশ্চুপ থাকাটাও কি সংকটের ভয়াবহতা বাড়াচ্ছে না? একজন রূপার মৃত্যুই সমস্ত সমাজের চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে যে, এ সমাজ নারীদের জন্য কতটা নিরাপদ। পথ-ঘাট-মার্কেট-গণপরিবহন-উৎসবস্থল, এমনকি আপন ঘরে, অতি প্রিয়জনের কাছেও নারী ও কন্যাশিশু নিরাপদ নয়। অনেকে তাদের সন্তানকে চোখে চোখে রেখেও রক্ষা করতে পারছেন না।

প্রথম আলোর অনুসন্ধানী প্রতিবেদন অনুসারে শুধু ঢাকা জেলার ৫টি ট্রাইব্যুনালে গত ১৫ বছরে ৭ হাজার ৮৬৪টি মামলার মধ্যে ৪ হাজার ৫ শত ৮৫টি মামলা ছিল ধর্ষণের ও ৮৫৬টি ছিল গণধর্ষণের। এ থেকেই বুঝা যায়- কী ভয়াবহতা বিরাজ করছে গোটা সমাজ মননে। এটিই শেষ নয়। ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের সাম্প্রতিক এক জরিপে দেখা গেছে যে, গণপরিবহনে যাতায়াতকারী ৯৪ শতাংশ নারী কোনো না কোনোভাবে যৌন হয়রানির শিকার। অপরদিকে বাংলাদেশ যাত্রী কল্যাণ সমিতির প্রতিবেদনে দেখা যায় যে, গত ১৩ মাসে ২১ জন নারী গণপরিবহনে ধর্ষণের শিকার হয়েছে।

এ প্রসঙ্গে গণপরিবহনে নারীর নিরাপত্তা নিয়ে কিছু বলা প্রয়োজন। গণপরিবহন সাধারণ নাগরিকদের যাতায়াতের জন্য পরিবহন। এখানে নারী-পুরুষ-শিশু-বৃদ্ধ সবাই যাতায়াত করে। পূর্বে গণপরিবহনে নারীদের যাতায়াতের হার কম হলেও বর্তমানে শ্রমজীবী-কর্মজীবী নারী-ছাত্রী-মধ্যবিত্ত নারী তাদের নানা প্রয়োজনে গণপরিবহন ব্যবহার করেন। জনসংখ্যার তুলনায় পরিবহনের সংখ্যা অল্প বলে দিনে-রাতের বেশিরভাগ সময়ে প্রবল ভিড় থাকে। ঢাকায় এ চিত্র নিত্যদিনের। পরিবহনগুলোতে নারীদের জন্য ৩০ শতাংশ আসন সংরক্ষণের কথা বলা হলেও কখনও কখনও পুরুষরাই সেখানে বসে পড়ে। প্রতিবাদ করেও কাজ হয় না। ভিড়ের মধ্যে নারী লাঞ্ছনার ঘটনা প্রায়ই ঘটে। ঘটে ধর্ষণ-গণধর্ষণের ঘটনা পর্যন্ত। ২০১৩ সালের ২৪ জানুয়ারি ঢাকা-আরিচা মহাসড়কে চলন্ত শুভযাত্রা পরিবহনে এক গার্মেন্ট কর্মী গণধর্ষণের শিকার হন।। ঢাকায় লাব্বায়েক বাসের ভিতরে বাংলাদেশ লেদার টেকনোলজির এক ছাত্রী যৌন হয়রানির শিকার হন। নিউ ভিশন পরিবহনে *(৬ষ্ঠ পৃষ্ঠায় দেখুন)*

আমাদের করণীয়

২০০৩ সালে প্রেসিডেন্ট সাদ্দাম হোসনের কাছে 'মারাত্মক মারণাস্ত্র' আছে অভিযোগ তুলে ইরাকে আগ্রাসন চালিয়েছিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। সাদ্দাম হোসেনকে বর্বরোচিত কায়দায় হত্যা করে ধ্বংসস্তূপে পরিণত করে ইরাককে। উদ্দেশ্য ছিল দেশটির তেল-গ্যাস লুটপাট করা। সেই একই কায়দায় মিথ্যা অভিযোগে এবার সিরিয়ায় হামলা চালিয়েছিল সাম্রাজ্যবাদী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য ও ফ্রান্সের মিলিত শক্তি। ইরাকে সফল হলেও মুখোশ খুলে পড়ায় নগ্ন চেহারা দিবালোকের স্পষ্ট হয়েছে।

অস্ত্রের ব্যবসা ও তেল-গ্যাস লুণ্ঠনে দেশে দেশে সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসনের বিরুদ্ধে সোচ্চার হতে হবে বাম গ্রগতিশীলসহ যুদ্ধবিরোধী শক্তিগুলোকে। একইসাথে দেশে দেশে সাম্রাজ্যবাদের পাহাড়াদার পুঁজিবাদী শক্তিগুলোর বিরুদ্ধে জোরদার করতে হবে বাম-গণতান্ত্রিক আন্দোলন। সেই শিক্ষাই যেন দিয়ে গেল দৌমা শহরের মার্কিন প্রোপাগান্ডা মেশিন।

বাম মোর্চার বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ

ব্যাংক ও আর্থিক খাতে লুটপাট, স্বেচ্ছাচারিতা, পারিবারিকীকরণ ও অর্থপাচার বন্ধ এবং লুটপাটের দায় স্বীকার করে অর্থমন্ত্রীর পদত্যাগের দাবিতে গণতান্ত্রিক বাম মোর্চার উদ্যোগে গত ৯ মে বুধবার জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। গণতান্ত্রিক বাম মোর্চার সমন্বয়ক ও বাসদ (মার্কসবাদী)-র কেন্দ্রীয় নেতা শুভ্রাংশু চক্রবর্ত্তীর সভাপতিত্বে সমাবেশে বক্তব্য রাখেন বাম মোর্চার কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ।

দেশব্যাপী কার্ল মার্কসের দ্বিশততম জন্মবার্ষিকী পালন

গাইবান্ধা

চট্টগ্রাম

ময়মনসিংহ

সিলেট

গণপরিবহনে চরম অব্যবস্থাপনার দায় কার?

পটুয়াখালী উপজেলার প্রত্যন্ত গ্রাম দাসপাড়া। এ গ্রাম থেকে অনেক স্বপ্ন নিয়ে একদিন ঢাকায় এসেছিলেন তিনি। এসেছিলেন বেঁচে থাকার লড়াই করতে। কিন্তু সেই লড়াই শেষ হলো না, মাঝপথেই জীবনযোদ্ধা রাজীবকে পটুয়াখালী ফিরতে হলো কফিনবন্দী হয়ে। গাড়ির চাপে একটি হাত শরীর থেকে সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন হয়েছিল তার। ডাক্তারদের প্রাণান্তকর চেষ্টার পরও রাজীব চলে গেছে না ফেরার দেশে।

মো. আলম পঞ্চগড় থেকে পেটের দায়ে রিকশা চালাতে এসেছিলেন ঢাকা শহরে। বাড়িতে তার স্ত্রী ও সন্তানরা থাকত। আলমের উপার্জনের টাকায় সংসার চলত। পুরো সংসারের দায়িত্ব ছিল তার। কিন্তু গাড়ির ধাক্কায় জীবনের সমস্ত দায়িত্ব থেকে মুক্তি মিলেছে আলমের।

ঘটনাগুলো এই সময়ের। রাজধানীর গণপরিবহনে চরম নৈরাজ্যকর অবস্থার খণ্ডচিত্র। বেসরকারি একটি হিসাব অনুযায়ী, প্রতিবছর সড়ক দুর্ঘটনায় প্রাণ হারায় ৯ হাজার থেকে ২১ হাজার মানুষ। এর কারণ হিসাবে বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের (বুয়েট) গবেষণা বলছে, ৯০ শতাংশ দুর্ঘটনার জন্য অতিরিক্ত গতি ও চালকের বেপরোয়া মনোভাব দায়ী। বাস-মিনিবাসের বেপরোয়া চলাচল ও প্রতিযোগিতার বলি হচ্ছে সাধারণ মানুষ। যেখানে-সেখানে যাত্রী ওঠানামা, ট্রাফিক আইন ভঙ্গ করা ও বিশৃঙ্খলা এখন ঢাকার গণপরিবহনের সাধারণ চিত্র। কিন্তু পরিস্থিতি কেন এমন? কিংবা অপরাধীরা পার পেয়ে যাচ্ছে কেন? – এই বিষয়গুলো বিশ্লেষণ করা দরকার।

ঢাকা ও এর আশেপাশে এখন বাস-মিনিবাস চালাতে হলে দিনে ৭০০ থেকে ১ হাজার ৭০০ টাকা পর্যন্ত চাঁদা দিতে হয়। প্রতিদিন চাঁদা ওঠে প্রায় ১ কোটি টাকা। মন্ত্রী, এমপি, সরকারদলীয় ব্যক্তিরা এই চাঁদা নিয়ন্ত্রণ করে। এই প্রভাবশালী ব্যক্তিরা বেশিরভাগই বাস কোম্পানির মালিক হয়েছে ২০০৯ সালে আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আসার পর। ফলে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী এখানে দর্শকের ভূমিকা পালন করে। তাই তারা ফিটনেসবিহীন

রাজীবের বিচ্ছিন্ন হাত

ও রংচটা পরিবহনের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয় না। বিআরটি'এর হিসাব অনুযায়ী, সারাদেশে ১২ লাখ পরিবহনের লাইসেন্স নেই। আর ২ লাখ পরিবহনের লাইসেন্স পেয়েছে যোগ্যতার যথাযথ পরীক্ষা ছাড়াই। এ ধরনের অব্যবস্থাপনার মাশুল দিচ্ছে সাধারণ মানুষ। মন্ত্রী ও এমপিরা ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের সরকার সমর্থক কাউন্সিলরসহ প্রায় ২০-২৫ জন নিজ নামে বা পরিবারের সদস্যদের নামে কোম্পানি করে বাস পরিচালনা করছে। আর নিজেদের পকেট ভারী করছে। সড়ক দুর্ঘটনায় আপনজন হারিয়ে যারা আজ দিশেহারা, সেই মানুষদের কান্না অনুভব করতে পারার কথা নয় এই লুটেরাদের।

প্রতিটি বাস-মিনিবাস দিনের শুরুতে যে আয় করে, তা থেকে কোম্পানির চাঁদা পরিশোধ করে। জিপি, ওয়েবিল বা রুট খরচের নামে যে চাঁদা তোলা হয়, এর একটা অংশ খরচ হয় কোম্পানির অফিস ব্যবস্থাপনায়। এ ছাড়া আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর হয়রানি বন্ধে, স্থানীয় রাজনৈতিক চাঁদাবাজদের পেছনেও কিছু টাকা ব্যয় হয়। এসব কিছুর বাইরে মালিক সমিতি ও শ্রমিক ইউনিয়নের নামে ৭০ টাকা করে চাঁদা দেয়া হয়। সব মিলিয়ে ১৫০ থেকে ২০০ টাকার বেশি নয়। বাকিটা কোম্পানির প্রভাবশালী চেয়ারম্যান ও এমডিদের পকেটে যায়। সরকারি দলের লোকজন প্রায় সবগুলো গণপরিবহন ব্যবসায় যুক্ত আছে। ফলে এতে 'আইন' বলে কোনো শব্দ থাকছে না। দুর্নীতি ও লুটপাটের চরম শিখরে এখন গণপরিবহন খাত।

কথা হচ্ছিল 'মৈত্রী' পরিবহনের একজন যাত্রী সিদ্দিকুর রহমানের সাথে। তিনি দায়ী করলেন ঢাকার যানজটকে। বললেন, 'তীব্র যানজটের কারণে দীর্ঘসময় আটকে থাকে গাড়ি। এরপর যখন ছাড়ে, তখন একটা গাড়ির সাথে আরেকটা গাড়ির প্রতিযোগিতা শুরু হয় – কে আগে যাত্রী তুলবে এবং আগে যাবে। চালকদের কাছে যাত্রীদের সময়ের যেমন দাম নাই, তেমনি জীবনেরও নাই।' পাশাপাশি গাড়ির ড্রাইভার-হেলপারকে সারাদিনের পরিশ্রমের সিংহভাগ টাকা মালিককে দিয়ে দিতে হয়। একজন হেলপার ২৫০-৪০০ টাকার উপর আয় করতে পারে না, ড্রাইভারের আয় এর সামান্য বেশি। ফলে ড্রাইভার-হেলপারের উদ্দেশ্যই থাকে কতবেশি এবং কার আগে যাত্রী তোলা যায়। এই অসুস্থ প্রতিযোগিতায় পড়ে প্রাণ যায় অসহায় যাত্রীর।

সড়ক দুর্ঘটনায় দায়ের করা মামলাগুলোও যথাযথ গুরুত্ব পায় না। বিচারহীনতার সংস্কৃতি অপরাধের প্রবণতা আরও বাড়িয়ে তুলেছে। সম্প্রতি দৈনিক প্রথম আলো সাতটি *(৭ম পৃষ্ঠায় দেখুন)*

শিল্পাচার্য জয়নুল
সমাজের প্রতি দায়বদ্ধ এক শিল্পসাধক

সাধনা মানুষকে নিয়ে যেতে পারে অনেক দূরে। জন্ম-মৃত্যুর আড়ালে যেমন প্রতিনিয়ত ঢাকা পরে মানুষের অস্তিত্ব, তেমনি কিছু একনিষ্ঠতা, কিছু সাধনা, অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছানোর তীব্র স্পৃহা মানুষকে বাঁচিয়ে রাখে তার মৃত্যুর পরেও। তেমনই এক সাধকের নাম, শিল্পপ্রেমিকের নাম জয়নুল আবেদিন।

জয়নুল আবেদিনের জন্ম ১৯১৪ সালের ২৯ ডিসেম্বর তৎকালীন ময়মনসিংহ জেলার কিশোরগঞ্জ মহকুমার কেন্দুয়া গ্রামে এক মধ্যবিত্ত পরিবারে। তার বাবা তমিজউদ্দিন আহমেদ সাব-ইন্সপেক্টর ছিলেন সাধারণ গৃহিনী। মধ্যবিত্ত পরিবারের আবেদিনের পড়ালেখার কাছে।

স্কুলের নিয়মিত ফলাফলই যদি ভালো হয়, তবে জয়নুল ছাত্র ছিলেন না। স্কুলে বেশি আগ্রহ ছিল আপন স্কুলের সময় পেড়িয়ে তাঁর ঘরের বারান্দায় বসে আপন মনে এঁকে চলতেন ফুল, গাছ, পাখি, মানুষ, পশুপাখিসহ দৈনন্দিন পরিবেশের বিস্তর উপাদান। শৈশব থেকেই শিল্পের প্রতি ছিলো তাঁর অকৃত্রিম ভালোবাসা। কিশোর জয়নুল একবার স্কুল পালিয়ে বন্ধুদের সাথে পাড়ি দিয়েছিলেন কলকাতা শহরে, শুধুমাত্র 'গভর্নমেন্ট স্কুল অব আর্টস'র আয়োজন দেখার জন্য।

আর মা জয়নাবুন্নেছা তৎকালীন আর দশটা মতোই জয়নুল হাতেখড়ি হয় মায়ের উপস্থিতি আর পরীক্ষার ছাত্র হবার মাপকাঠি আবেদিন খুব ভালো যাওয়ার চেয়ে তার মনে ছবি আঁকাতে। যেত, আর জয়নুল

জয়নুল ভাবতেন, বন্ধুদের সাথে বলতেন, শুধুমাত্র স্কুল-কলেজ পাশ না করলেও বড় মানুষ হওয়া যায়। শিল্পের প্রতি তাঁর প্রবল আকর্ষণ অচিরেই তাঁকে টেনে আনে প্রাতিষ্ঠানিক পড়ালেখার বলয় থেকে। মেট্রিক পরীক্ষা আর দেওয়া হয়নি তাঁর। পরিবারের সবার অমত সত্ত্বেও শুধুমাত্র নিজের শিল্পপ্রেমে আর মায়ের সহায়তায় চলে যান কলকাতায়। সেখানে ভর্তি হন আর্ট কলেজে।

জয়নুল আবেদিন ১৯৩৮ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত কলকাতার আর্ট স্কুলে পড়ালেখা করেন এবং গভর্নমেন্ট স্কুল অব আর্টসের ড্রইং অ্যান্ড পেইন্টিং ডিপার্টমেন্ট থেকে প্রথম শ্রেণিতে প্রথম হয়ে স্নাতক ডিগ্রি অর্জন করেন। কলকাতার কলেজে পড়ার অর্থ যোগান দিতে জয়নুলের মায়ের সেদিন গলার হার পর্যন্ত বিক্রি করতে হয়েছিল। তিনি সবসময় তাঁর ছেলের পাশে থেকেছেন।

জয়নুল আবেদিনের চিত্রকর্ম ছিল গণমুখী। মানুষের দৈনন্দিন জীবন, জীবনের লড়াই, প্রতি পদে বাধা, সেই বাধা উপেক্ষা করে আবার জীবনের জন্য ছুটে চলা ইত্যাদি ছিল তাঁর শিল্পকর্মের এক বিরাট অংশ জুড়ে। জয়নুল আবেদিনের শিল্পকর্মে স্থান পেয়েছে মানুষের শ্রম, শ্রমের বিনিময়ে গড়ে ওঠা সভ্যতার চিত্র। স্থান পেয়েছে মানব জীবনের উত্থান এবং পতনের গল্প।

খাদ্যাভাবে মানুষের মৃত্যু নিসর্গপ্রেমী এই শিল্পীর মনকে নাড়া দিয়েছিল বিপুলভাবে। যার প্রতিফলন ঘটেছে তাঁর ১৯৪৩ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশ পাওয়া দুর্ভিক্ষ চিত্রকর্মটিতে। তাছাড়া মানুষের দৈনন্দিন সংগ্রাম, দুঃখ-কষ্ট, দারিদ্র্য উঠে এসেছে তাঁর শিল্পকর্মে। তিনি এঁকেছেন মুক্তিযুদ্ধের ছবি, অস্ত্রহাতে পাকিস্তানি শাসকের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানো বিপ্লবী যোদ্ধার ছবি। একইভাবে লক্ষ-কোটি মানুষ দেশ ছেড়ে আশ্রয়ের খোঁজে ছুটে চলার ছবিও জীবন্ত হয়ে উঠেছে তাঁর তুলিতে। তাঁর এ চিত্রকর্মটি '১৯৭১-এ বীর মুক্তিযোদ্ধা' নামে প্রকাশিত। 'নবান্ন', ১৯৭৪-এ আঁকা 'মনপুরা-৭০', ১৯৫৭-এ 'নৌকা', ১৯৫৯-এ 'সংগ্রাম' তাঁর বিখ্যাত চিত্রকর্ম।

আমৃত্যু শিল্প সাধনায় নিমগ্ন এই শিল্পী শিল্পের বিকাশের জন্য কাজ করে গেছেন। তাঁর উদ্যোগে ১৯৪৮ সালে পুরান ঢাকার জনসন রোডে একটি কক্ষে ১৮ জন ছাত্র নিয়ে আর্ট কলেজ গড়ে ওঠে। যা পরবর্তীতে সেগুনবাগিচা এবং তারপরে শাহবাগে স্থানান্তরিত হয় এবং শেষ পর্যন্ত একটি সরকারি কলেজ হিসেবে স্বীকৃতি পায়। জয়নুল আবেদিনের অনুপ্রেরণাতেই ১৯৭৫ সালে নারায়ণগঞ্জের সোনারগাঁয়ে লোকশিল্প জাদুঘর ও ময়মনসিংহে জয়নুল সংগ্রহশালা প্রতিষ্ঠিত হয়।

শিল্পের জন্য শিল্প নয় বরং মানুষের জন্যই শিল্প – এমনই ছিল তাঁর শিল্প সংক্রান্ত দর্শন। যার ফলে তাঁর শিল্পে জীবনবোধ, জীবন সংগ্রামের ছবি ভেসে উঠেছে স্পষ্ট হয়ে। জয়নুল আবেদিনের শিল্প আপাদমস্তক মানুষের কথা বলে।

নিবিড় মনোযোগ, একান্ত সাধনা, একনিষ্ঠতা যে মানুষকে সাফল্যের সোপানে নিয়ে যায় – তার উদাহরণ জয়নুল আবেদিন। শিল্পী, তাঁর শিল্পকর্ম যে সমষ্টির কাছে, সমাজের কাছে দায়বদ্ধ – তারও যথার্থ এক উদাহরণ জয়নুল আবেদিন।

তিনি ১৯৭৬ সালের ২৮ মে মৃত্যুবরণ করেন। কিন্তু তিনি এখনো বেঁচে আছেন তার শিল্পে, বেঁচে আছেন শিল্পসাধনার উজ্জ্বল নক্ষত্র হয়ে।

নতুন ‘মে দিন’ আনতে হবে শ্রমিকদের

(১ম পৃষ্ঠার পর) আমেরিকার ফেডারেল কোর্টের ইনজাংশন অমান্য করে ধর্মঘট করার অপরাধে ১৩শ ধর্মঘটীকে গ্রেফতার করে পুলিশ। এর প্রতিবাদে ১৮৮৬ সালের পহেলা মে শিকাগোসহ যুক্তরাষ্ট্রের সকল শহরে ও শিল্পাঞ্চলে সফল ধর্মঘট হয়। আমেরিকার বুর্জোয়া প্রেসের তথ্য অনুযায়ীই সেদিন সারাদেশে তিন লাখ চল্লিশ হাজার শ্রমিক মিছিল করেছিল। শুধু শিকাগোতেই মিছিলে অংশ নিয়েছিল আশি হাজার শ্রমিক। পহেলা মে-তে কোনো ধরনের রক্তপাত হয়নি, যদিও পুলিশ ও মালিকের দালালদের উস্কানি ছিল। ৩ ও ৪ মে পুলিশ বিনা কারণে গুলি চালায়। এরপর শুরু হয় চরম রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস। আমেরিকার বড় বড় বুর্জোয়া কাগজগুলো দাবি করে – ‘প্রত্যেকটি ল্যাম্পপোস্ট কমিউনিস্টদের লাশ দ্বারা সুসজ্জিত করা হোক’। যারা শ্রমিক খুন করল তাদের বিচার হলো না, বিচার হলো শ্রমিক নেতাদের। এ বিচার ছিল প্রহসনমূলক। মিথ্যা অভিযোগে চারজন শ্রমিক নেতাকে ফাঁসি দেওয়া হলো। স্পাইজ, ফিশার, এঞ্জেল ও পার্সনস শ্রমিক শ্রেণির মহান চার বীর নির্ভীক চিত্তে ফাঁসির মঞ্চে জীবন দিলেন।

যুক্তরাষ্ট্রে এই প্রহসনমূলক বিচার প্রতিক্রিয়ায় আমেরিকা ও ইউরোপে প্রতিবাদের ঝড় উঠল। এরপর ১৮৮৯ সালের ১৪ জুলাই ফ্রেডারিখ এঙ্গেলসের নেতৃত্বে দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক শ্রমজীবী সমিতির প্রথম কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হলো প্যারিসে। উক্ত কংগ্রেসে সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো – শিকাগোর মহান শ্রমিক সংগ্রাম স্মরণে পরের বছর অর্থাৎ ১৮৯০ সাল থেকে প্রতি বছর পহেলা মে বিশ্বব্যাপী আন্তর্জাতিক শ্রমিক সংহতি দিবস হিসাবে পালিত হবে। তখন থেকেই শ্রমিক শ্রেণি মে দিবস পালন করে আসছে। তাই মে দিবস নিছক আনন্দ-উদযাপন করার দিন নয়। সকল ধরনের শোষণ-জুলুম-বৈষম্য থেকে মুক্তি অর্জনের জন্য শপথ গ্রহণের দিন।

শ্রমিকরা আজ কেমন আছে?

মে দিবসে শ্রমিকদের লড়াই এবং জীবনদানের বিনিময়েই মালিকেরা স্বীকার করে নিয়েছিল শ্রমিকেরাও মানুষ, তারা যন্ত্র নয়, তাদেরও বিশ্রাম বিনোদনের অধিকার আছে। এর স্বীকৃতিস্বরূপ এক পর্যায়ে আন্তর্জাতিকভাবে ৮ ঘণ্টা কর্মদিবস নির্ধারিত হয়েছিল। শ্রমিকশ্রেণি পেয়েছিল তাদের লড়াইয়ের হাতিয়ার- ট্রেড ইউনিয়ন গড়ে তোলার অধিকার। বিশ্বব্যাপী জোরদার সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের চাপে বহুদেশে তা বাস্তবায়িতও হয়েছিল। আমাদের দেশেও শ্রমিকশ্রেণির সেসব অধিকার, অন্ততপক্ষে সংবিধানে ও কাগজে-কলমে স্বীকৃতি পেয়েছিল। কিন্তু আজকে যেন গোটা বিশ্ব আবারও উনিশ শতকে ফিরে যাচ্ছে। সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়নসহ সমাজতান্ত্রিক শিবিরের বিপর্যয় এবং শ্রমিক আন্দোলনের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে দেশে দেশে মালিকশ্রেণি আবারও উন্মত্ত হয়ে উঠেছে। লাগামহীন শোষণ ও লুটপাটের স্বার্থে তারা শ্রমিকশ্রেণির সমস্ত অধিকারকে পায়ে মাড়াচ্ছে।

বাংলাদেশের শ্রমজীবী মানুষের বর্তমান অবস্থার সাথে দেড়শ বছর পূর্বেকার অবস্থার বড় কোনো পার্থক্য খুঁজে পাওয়া যাবে না। আজ শুধু শ্রমিকরা নন, যারা বহু বেতনের কর্পোরেট কাজ করেন তারাও ৮ ঘণ্টা কাজের অধিকার পান না। পুঁজিবাদ শ্রমিকের জীবন থেকে স্বাভাবিক বিশ্রাম-বিনোদন কেড়ে নিয়েছে। যে জীবনকে সচল রাখতে জীবিকার প্রয়োজন সেই জীবিকাই খেয়ে ফেলে জীবনের পুরোটা। এদেশে এখনো অধিকাংশ শ্রমিক নিয়োগপত্র, ট্রেড ইউনিয়ন অধিকার, ওভারটাইম, গ্রাচুইটি, প্রভিডেন্ট ফান্ড, বোনাস, লভ্যাংশ কিছুই পায় না। না আছে কারখানায় বা কর্মস্থলে থাকার মতো ব্যারাক-কলোনি, না আছে চিকিৎসা সুবিধা, না পায় রেশন। দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি, বাড়িভাড়া-গাড়িভাড়া বৃদ্ধি, গ্যাস-বিদ্যুৎ-পানির বিল বৃদ্ধি, শিক্ষা-চিকিৎসার বাড়তি খরচের চাপে সীমিত আয়ের শ্রমিক-কর্মচারীরা দিশেহারা। ২০১৪ সালের ২৪ এপ্রিল রানা প্লাজাতে হাজারো শ্রমিক মরেছিল, কিন্তু আজও কর্মস্থলে শ্রমিকের নিরাপত্তা নেই, নেই কাজের সুষ্ঠু পরিবেশ। মালিকদের লক্ষ্য মুনাফা, শ্রমিকের জীবন তাদের কাছে মূল্যহীন। আর সরকার মালিকদের ব্যবসার উন্নতির জন্য মনোযোগী; শ্রমিকদের কর্মপরিবেশ ও জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে তাদের যেন কোনো দায়িত্ব নেই। কোনো আধুনিক ক্ষতিপূরণ আইন সরকার করেনি।

ইনফরমাল সেক্টরের শ্রমিকরা ভয়াবহ বৈষম্যের শিকার

সর্বাধিক দুর্দশার শিকার অসংগঠিত বা ইনফরমাল সেক্টরের শ্রমিকরা। তারা আজো শ্রম আইনের সুবিধা পায় না। মালিকের মর্জির ওপর তাদের চাকুরি ও পাওনা নির্ভরশীল, সরকারের যেন তাদের বিষয়ে কোনো দায়িত্ব নেই। ফলে কৃষি শ্রমিক, নির্মাণ শ্রমিক, তাঁত শ্রমিক, চাতাল শ্রমিক, ইটভাটা শ্রমিক, দোকান কর্মচারী, হোটেল শ্রমিক, পুস্তক বাঁধাই শ্রমিক, রেডিমেড ও অর্ডারি দর্জি শ্রমিক, গৃহকর্মী, নৈশ প্রহরী, রিকশাচালক, কাঠ মিস্ত্রি, হকার, ফেরিওয়ালাসহ কোটি কোটি শ্রমিক আইনী অধিকারবঞ্চিত মানবেতর জীবনযাপন করে। অথচ সরকারি হিসেবে দেশে যত কর্মসংস্থান হয়, এর ৮৫ শতাংশই অনানুষ্ঠানিক খাতে। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস) কর্তৃক ‘শ্রমশক্তি জরীপ ২০১৬-১৭’ এর হিসাবে দেশে কর্মক্ষম মানুষ (অর্থাৎ ১৫-৬৪ বয়সের) ১০ কোটি ৯১ লাখ। কাজে নিয়োজিত আছে ৬ কোটি ৮ লাখ, বেকার ২৬ লাখ ৮০ হাজার (৪.২%)। কর্মরতদের মধ্যে অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে ৫ কোটি ১৭ লাখ লোকের কর্মসংস্থান হয়েছে, আর আনুষ্ঠানিক খাতে ৯১ লাখ। ইনফর্মাল সেক্টরে চাকুরির স্থায়িত্ব যেমন নেই, তেমনি নেই তাদের বেতন, পেনশন, স্বাস্থ্য, বীমা ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা। গ্রামীণ কৃষি শ্রমিকদের রেজিস্ট্রেশন ও সারা বছর কাজের নিশ্চয়তা নেই। চা শ্রমিকদের দৈনিক মজুরি ৮৫ টাকা মাত্র। বিকল্প ব্যবস্থা না করে রিকশা উচ্ছেদ চলছে। গৃহশ্রমিকরা তো আজ অবধি শ্রমিকের মর্যাদাই আদায় করতে পারেননি।

আইনে শিশুশ্রম নিষিদ্ধ হলেও অনিয়মিত শ্রমের ক্ষেত্রে শিশুশ্রম একটি নিয়মিত ঘটনা। ‘জাতীয় শিশুশ্রম সমীক্ষা ২০১৩’ অনুযায়ী এদেশে কর্মরত শিশু (৪-১৭ বছর) সাড়ে ৩৪ লাখ, শিশুশ্রমিক (৪-১১ বছর) হিসেবে গণ্য হয় ১৭ লাখ। [সূত্র : দৈনিক ইত্তেফাক ১২.৬.২০১৭] দেশের অর্থনীতির আরেকটি বড় নিয়ামক বিদেশে কর্মরত অভিবাসী শ্রমিকদের পাঠানো রেমিট্যান্স। প্রবাসে ও স্বদেশে ওই শ্রমিকদের অধিকার নিশ্চিত করার ব্যাপারেও রাষ্ট্রের দায়িত্বশীল কোনো ভূমিকা নেই। দেশে দৈনিক ভিত্তিতে ও চুক্তিভিত্তিক শ্রমিক নিয়োগের হার ক্রমান্বয়ে বেড়ে চলেছে। এই শ্রমিকেরা চাকুরীকালীন আইনানুগ সুবিধাপ্রাপ্তি থেকে বঞ্চিত। ইদানিং বিভিন্ন মোবাইল অপারেটর, পোশাক শিল্প, নির্মাণ শিল্পসহ নানাবিধ শিল্পে ঠিকাদারের মাধ্যমে শ্রমিক নিয়োগ এবং তাদেরকে যখন-তখন কর্মস্থল থেকে কোনো সার্ভিস বেনিফিট প্রদান না করেই বিদায় করা হচ্ছে। এতে করে শ্রমিকের ভবিষ্যৎ, সামাজিক নিরাপত্তা বিঘ্নিত হচ্ছে।

পোশাক শ্রমিক : সর্বোচ্চ আয়কারী হয়েও তীব্র অবহেলিত

এদেশের সর্ববৃহৎ প্রাতিষ্ঠানিক খাত পোশাকশিল্প। যথাযথ মজুরি না দেওয়া, বাসস্থান, পরিবহন ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা না থাকা, সাপ্তাহিক ছুটি না দেওয়া, বাধ্যতামূলক অতিরিক্ত সময় কাজ করানো, মাতৃত্বকালীন ছুটি না দেওয়া গার্মেন্ট শিল্পের নিয়মিত সমস্যা। আইনে থাকলেও পাঁচ বছরের কম বয়সী শিশুদের জন্য কোনো শিশুপরিচর্যা কেন্দ্রের ব্যবস্থা না থাকা, আগুন লাগাসহ অন্যান্য দুর্ঘটনা এড়ানোর জন্য বিকল্প ব্যবস্থার পর্যাপ্ত অভাব, শ্রমিকদের স্বাস্থ্যসেবার ব্যবস্থা না থাকাও গার্মেন্ট শ্রমিকদের বড় সমস্যা। বিদেশি ক্রেতা, বিদেশি সামাজিক সংগঠনসহ দেশি নানা সংগঠন, প্রতিষ্ঠানের গভীর দৃষ্টি রয়েছে গার্মেন্ট খাতের ওপর। তারপরও এখানকার শ্রমিকরা এখনও ট্রেড ইউনিয়ন করার আইনি অধিকার পাননি। সরকার ও মালিকপক্ষের চাপে এই খাতের শ্রমিকরা এই অধিকার থেকে এখনো বঞ্চিত।

বাংলাদেশের রপ্তানি আয়ের ৮২% আসে গার্মেন্টস শিল্প থেকে। গার্মেন্টস শিল্পের উন্নতি হচ্ছে, রপ্তানি আয় বাড়ছে, অথচ শ্রমিক বেঁচে থাকার মতো মজুরি পায় না। আইএলও কনভেনশনের ১৩১ নং ধারায় বলা হয়েছে, ‘সর্বনিম্ন মজুরি অবশ্যই আইন দ্বারা নিশ্চিত করতে হবে। শ্রমিক ও তার পরিবারের প্রয়োজন, জীবনযাত্রার ব্যয়, সামাজিক নিরাপত্তা সুবিধা ইত্যাদিকে বিবেচনায় নিয়ে ন্যূনতম মজুরি নির্ধারণ করতে হবে।’ সরকার নিযুক্ত নিম্নতম মজুরি কমিশন ন্যূনতম মজুরি বৃদ্ধি করার পেছনে জীবনযাত্রার খরচ, শ্রমিকের এবং তার পরিবারের চাহিদা, উৎপাদনের খরচ, উৎপাদনশীলতা, পণ্যের দাম, নিয়োগকারীদের ক্ষমতা, দেশের অর্থনৈতিক এবং সামাজিক অবস্থা, মুদ্রাস্ফীতির হার ইত্যাদি বিষয় বিবেচনা করে থাকে। এ সবকিছু বিবেচনায় নিয়ে আমাদের সংগঠন গার্মেন্টস শ্রমিক ফেডারেশনসহ বিভিন্ন সংগঠন দাবি তুলেছে – বর্তমান বাজারে মানুষের মতো বাঁচতে হলে নিম্নতম মোট মজুরি ১৬,০০০ টাকা (বেসিক মজুরি ১০০০০ টাকা, ৪০% বাড়িভাড়া ৪০০০ টাকা, চিকিৎসা ভাতা ৫৭০ টাকা, যাতায়াত ভাতা ৭৮০ টাকা, টিফিন ভাতা ৬৫০ টাকা) দিতে হবে। এ দাবি অত্যন্ত যৌক্তিক। কারণ, ২০১৫ সালে ঘোষিত জাতীয় পে-স্কেলে সরকারি কর্মচারীদের সর্বনিম্ন বেতন নির্ধারিত হয়েছে প্রায় ১৫,২৫০ টাকা। শ্রমিকরা এর চাইতে কম পেতে পারে না। বাংলাদেশে সর্বনিম্ন মজুরি ৫,৩০০ টাকা অন্যান্য সকল গার্মেন্টস পণ্য রপ্তানিকারক দেশের চেয়ে অনেক কম।

শ্রমশোষণের মানবিক মুখোশ ‘সি এস আর’

কর্পোরেট পুঁজির শোষণকে আড়াল করার জন্য আপাতদৃষ্টিতে এই শোষণের একটা মানবিক মুখোশ দেওয়ার চেষ্টা হচ্ছে। সেই চেষ্টার একটি পোশাকী নাম তারা বের করেছে ‘কর্পোরেট সোশ্যাল রেসপনসিবিলিটি’ (সি এস আর) বা পুঁজির সামাজিক দায়বদ্ধতা। এই সামাজিক দায়বদ্ধতা তহবিলের মাধ্যমে সমাজের বা রাষ্ট্রের হেন দিক নেই যেখানে পুঁজি তার খুদকুঁড়ো ছিটাচ্ছে না। আমাদের জাতীয় পতাকা বা জাতীয় সঙ্গীতের গিনেস বুকে নাম উঠানোর কর্মসূচি বা ক্রিকেটের স্পন্সর, সবখানে কর্পোরেট পুঁজির টাকা যাচ্ছে। খুব মার্জিতভাবে হাত খুলে দান-দক্ষিণা করছে, ভদ্রতার মুখোশ পরে জনকল্যাণ কর্মসূচির নামে সংগঠন বা ব্যক্তিকে পুরস্কৃত করা হচ্ছে। কিন্তু তাদের অধীনে কর্মরত লক্ষ লক্ষ শ্রমিক কর্মচারীর জীবন মান উন্নয়নে বা তাদের সংগঠিত হওয়ার অধিকার এই দানশীল পুঁজির মালিকেরা কখনও মেনে নেয় না।

উন্নয়নের তীব্র শোরগোল প্রতিদিন যেন উপহাস করছে সাধারণ মানুষকে। মধ্যম আয়ের দেশ, ১৬১০ ডলার মাথাপিছু আয় – এসব বুলির সাথে মানুষ তার জীবনের সঙ্গতি খুঁজে পায় না। এ সমাজে শ্রমিক যেমন বাঁচার মতো মজুরি পায় না, কৃষকও পায় না ফসলের দাম। গরিব সাধারণ মানুষ হারাচ্ছে শিক্ষা-চিকিৎসার সুযোগ। অন্যদিকে চুরি-দুর্নীতি লুটপাটের মধ্য দিয়ে সমাজের ক্ষুদ্র অংশের হাতে জমা হচ্ছে অঢেল সম্পদ। গত ১০ বছরে এরা দেশ থেকে পাচার করেছে ৬ লক্ষ কোটি টাকা। সমাজ জুড়ে আজ এই মালিকদেরই দাপট। রাজনীতির নিয়ন্ত্রকও তারাই। মালিকী এ ব্যবস্থা ও রাজনীতির বদল ছাড়া শ্রমিকসহ কারো জীবনেই মুক্তি আসবে না।

সভ্যতার কারিগর শ্রমিকশ্রেণি, কিন্তু নামমাত্র মজুরি ছাড়া উৎপাদনের সুফল তারা পায় না। ১৮৪৮ সালেই মহামতি মার্কস-এঙ্গেলস দেখিয়েছিলেন – পুঁজিবাদী সমাজে উৎপাদনযন্ত্রের মালিকানা পুঁজিপতি শ্রেণির হাতে থাকার কারণে উদ্বৃত্ত সম্পদের সিংহভাগ তারাই ভোগ করে। মালিকরা পুঁজির জোরে রাষ্ট্র চালায়, আইন-পুলিশ-বিচারবিভাগ সবকিছু তাদের হাতে। ফলে এই শোষণমূলক সমাজে শ্রমিকের পরিপূর্ণ অধিকার ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়। এজন্য চাই সমাজতন্ত্র, যেখানে উৎপাদনযন্ত্রের ওপর ব্যক্তির পরিবর্তে সামাজিক মালিকানা কায়েম এবং সম্পদের সুষম বণ্টন হবে। মে দিবসের রক্তেভেজা ইতিহাস সেই লড়াইয়ের অনুপ্রেরণা হিসাবে কাজ করছে।

নারী-শিশু নির্যাতনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে সোচ্চার হোন

(৪র্থ পৃষ্ঠার পর) ইডেন কলেজের এক ছাত্রী একই কায়দায় যৌন হয়রানির শিকার হন। গত ২১ এপ্রিল তুরাগ বাসে উত্তরা বিশ্ববিদ্যালয়ের এক ছাত্রীকে বাসের হেলপার-সুপারভাইজার যৌন হয়রানির চেষ্টা করলে বিশ্ববিদ্যালয়ের শত শত শিক্ষার্থী প্রতিবাদ করে। পরবর্তীতে পুলিশ অভিযুক্তদের গ্রেফতার করতে বাধ্য হয়।।

নারী নির্যাতনের সাথে যারা যুক্ত তাদের বিচার হয় না এদেশে। পরিসংখ্যান বলছে এ যাবৎকালে নারী নির্যাতনের যত ঘটনা ঘটেছে তার মাত্র ৩ শতাংশের বিচার হয়েছে। শাসকরা এই ধর্ষক-অপরাধীদের মদদ দেয়। অনেক ক্ষেত্রে নির্যাতকরা হয় সরকারি দলের নেতা বা কর্তাব্যক্তি।

প্রশ্ন হলো – নারী ও কন্যাশিশুর এই নিরাপত্তাহীনতা কেন? দুটো খুব গুরুত্বপূর্ণ কারণ আছে – একটি হলো পুরুষতান্ত্রিকতা অন্যটি ভোগবাদিতা। পুরুষতান্ত্রিকতার কারণে পুরুষের চোখে, কর্তৃত্বের চোখে নারীকে দেখা হয়; আর ভোগবাদী দৃষ্টিভঙ্গি শেখায় নারী হলো পণ্য। এই দুই জঘন্য চিন্তার শিকার সমাজের বহু পুরুষ, এমনকি নারীরাও। এই চিন্তা মানুষের মনুষ্যত্ব-মানবিকতাকে নিঃশেষ করে দেয়। অমানুষ বানিয়ে কেবল পাশবিক অনুভূতিগুলোকে জাগিয়ে রাখে।

এ সমাজ আমাদের সকলের। নারী এ সমাজের অর্ধাংশ, এ সমাজের নাগরিক। নারী ও কন্যাশিশুর উপর এ পাশবিকতা কি আমাদের বিবেককে নাড়িয়ে দেয় না? প্রতিদিন নারী ও শিশু ধর্ষণ-গণধর্ষণ-যৌন হয়রানির খবর পত্রিকার পাতায় পড়ব, টেলিভিশনে খবর দেখব কিন্তু কোনো কিছুই করব না – একি হতে পারে? কেবল আফসোস দেখানো পর্যন্ত কি আমাদের দায়িত্ব? তাহলে অন্যায় করা আর সহ্য করার মধ্যে কোনো পার্থক্য থাকে কি?

মাছের অভাব পূরণ করে যারা, তাদের দুঃখ ঘোচাবে কে?

(১ম পৃষ্ঠার পর) জেলে হইয়া জন্মানোটাই একটা অন্যায় আচিল।' পরিবারের তীব্র অভাব-দারিদ্র্য নাজমুলকে বাধ্য করেছিল মাছ ধরার কাজে যুক্ত হতে। এ কাজ না করলে তার রান্নাঘরে আগুন জ্বলত না, ছোট ভাই-বোনগুলো হয়ত এতদিনে না খেয়েই মরত। এমন দুর্বিষহ পরিস্থিতির মধ্যে চাঁদপুর জেলার ১৫ হাজার জেলে তাদের জীবন-জীবিকা নির্বাহ করে। সমুদ্র তীরবর্তী বরগুনা, পটুয়াখালী, পিরোজপুর, ঝালকাঠি, ভোলা, লক্ষ্মীপুর, নোয়াখালী, চাঁদপুরসহ উপকূলীয় এলাকায় বসবাসরত লক্ষ লক্ষ জেলে পরিবার এরকম অবস্থার মধ্যে জীবন পার করছে।

ইলিশ আমাদের জাতীয় মাছ। উচ্চ পুষ্টিগুণ ও অর্থনৈতিক মূল্য ছাড়াও বাঙালি সংস্কৃতিতে এই মাছটির রয়েছে আলাদা স্বকীয়তা। বাংলাদেশে পাঁচ লাখেরও বেশি উপকূলীয় জনগণ এই মাছ ধরার সাথে সাথে সরাসরি জড়িত। পাশাপাশি মাছ বিপণন, পরিবহন ও বাজারজাতকরণের সঙ্গে যুক্ত আছে আরো প্রায় ৩০ লাখ মানুষ। সম্প্রতি চাঁদপুর জেলা প্রশাসন 'ব্র্যান্ড অব হিলসা' উপাধি পেয়েছে। কিন্তু যারা প্রত্যক্ষভাবে এ কাজের সাথে যুক্ত তাদের অবস্থা কী? পাওয়ার অ্যান্ড পার্টিসিপেশন রিসার্চ সেন্টার (পিপিআরসি) পরিচালিত এক গবেষণায় দেখা যায়, চাঁদপুর নদীর পাড়ে ৩৩% জেলের নিজস্ব কোনো বসতভিটা নেই, প্রায় ৪০% জেলের কোনো নৌকা নেই এবং ২৯% জেলের কোনো মাছ ধরার জাল নেই। অন্যান্য জেলায় বসবাসরত জেলেদের অবস্থা এর চেয়ে ভালো নয়।

ইলিশ মাছের ডিম পারার মৌসুমে জেলেদের পরিস্থিতি আরও খারাপ হয়। কেননা তখন মাছ ধরার নিষেধাজ্ঞা থাকে। এ অবস্থায় দীর্ঘদিনের দাবির প্রেক্ষিতে সরকার প্রতি পরিবারের জন্য ১৬০ কেজি করে চাল দেবার কথা ঘোষণা করেছিল। কিন্তু এসব ঘোষণা ছিল লোক দেখানো। প্রকৃতপক্ষে তথাকথিত জন প্রতিনিধিদের দুর্নীতির কারণে ২৫-৩০ কেজির বেশি চাল জেলেরা পায় না। আবার এ চালও আসে নিষেধাজ্ঞা মৌসুম পেরোনোর অনেক পরে। এ অবস্থায় একমুঠো খাবারের জন্য অনেকেই নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে মাছ ধরতে যেতে বাধ্য হয়। এজন্য নেমে আসে পুলিশের নির্মম নির্যাতন। নাজমুল হোসেন জানালেন, তিনিও ছয় মাস জেল খেটেছিলেন। দেশের আইন-বিচারব্যবস্থা কতটা বৈষম্যমূলক! দরিদ্র-অসহায় জেলেদের কারাগারে ঢুকাতে পারলেও সরকার কোটি কোটি লুটপাটকারী-পাচারকারীদের টিকিটিও ছুঁতে পারে না।

মাছ ধরার সাথে যুক্ত মানুষরা আসলে কারা? তারা প্রায় সকলে নিম্নআয়ের মানুষ। সরকার এদের কাজ দিতে ব্যর্থ হয়েছে। এরা চুরি, ডাকাতি, ছিনতাই, রাহাজানি, হাট দখল, চর দখলের সাথে যুক্ত নয়। তারা তাদের জীবনকে বাঁচাতে, পরিবারকে বাঁচাতে এ পেশায় এসেছে। এ কাজ করতে গিয়েও কেউ হয়তো জমি বন্ধক রেখেছে, কেউ হয়ত গোয়ালের গরুটাও বিক্রি করেছে, নিজে একবেলা কম খেয়ে পরিবার-পরিজনকে কম খাইয়ে টাকা জমিয়ে জাল কিনেছে। অথচ এদের সাথে নিজেদের ক্ষমতার জোর দেখায় সরকার। একজন ১২-১৫ বছরের শিশু কখন জীবনের ঝুঁকি নিয়ে সাগরে মাছ ধরতে যায় – তা বোঝার মতো ন্যূনতম সংবেদনশীলতা দেশের কর্তাব্যক্তিদের নেই। সমুদ্রের ঝড়, জলোচ্ছ্বাস, দুর্যোগ উপেক্ষা করে তাদের মাছ ধরতে যেতে হয়। এই যে এত কষ্ট করে তবুও আসে না সোনালী দিন। কেননা তারা যে বন্দি আড়তদারদের কাছে। অভাবে তাড়নায় ঋণ নিতে হয় আড়তদারদের কাছ থেকে আবার আড়তদারদের নির্ধারণ করা দামে মাছ বিক্রি করতে হয়। যে টাকায় মাছ বিক্রি করে তাতে পরিশ্রমের মূল্যও ওঠে না, পরিবার-পরিজনদের ভালো রাখা তো কষ্টকল্পনা। ফলে ঋণের বোঝা বাড়তেই থাকে। জীবনের অবসান ঘটে কিন্তু ঋণ থেকে মুক্তি মেলে না।

প্রবল দারিদ্র আর পুলিশের নলের মাথার সামনে দাঁড়িয়ে মাছ ধরতে যায় নাজমুলরা। তারা সারা দেশের মানুষের আমিষের অভাব পূরণ করে। কিন্তু তাদের জীবনের অভাব পূরণ হয় না।

মানুষের নিরাপত্তার জন্য হুমকি

(শেষ পৃষ্ঠার পর) কোনো সমীক্ষা প্রকাশ না করে, সরকার কেবল একতরফাভাবে বিদ্যুৎ-সঙ্কটকে পুঁজি করে প্রকল্পের পক্ষে সাফাই গেয়ে যাচ্ছে।

এককালে আশা জাগানিয়া 'গ্রীন এনার্জি' খ্যাত এই নিউক্লিয়ার বিদ্যুৎ নিয়ে চেরনবিল-ফুকুশিমার পরে গোটা বিশ্বই আবার নতুন করে ভাবছে। যদিও এর মধ্যে প্রযুক্তির অনেক অগ্রগতি হয়েছে কিন্তু এমআইটি থেকে প্রকাশিত গবেষণা বলছে, ২০৫৫ সালের মধ্যে অন্তত আটটি বিদ্যুৎকেন্দ্রের দুর্ঘটনার ঝুঁকি রয়েছে। নিউক্লিয়ার পাওয়ার প্ল্যান্টের ব্যবস্থাপনা এতটাই জটিল যে, সবকিছু সর্বাধুনিক প্রযুক্তিসহ ডিজাইন করলেও তাতে আর দুর্ঘটনা ঘটবে না বলে নিশ্চিত করে বলা যায় না।

প্রসঙ্গত জনবলহীন কাঠামো নিয়ে উচ্চ-প্রযুক্তির এমন দোহাই সুন্দরবনের কোল ঘেঁষে নির্মাণাধীন রামপাল বিদ্যুৎকেন্দ্রের ক্ষেত্রেও দেওয়া হয়েছিল। অথচ সার-তেল-কয়লাবাহী জাহাজডুবির ঘটনা আমরা প্রত্যক্ষ করছি নিয়মিত। 'দক্ষিণবঙ্গে উন্নয়নের জোয়ার' বইতে না বইতে সেখানে মাছ-মধু আহরণ বেঁচে থাকা জেলে-বাওয়ালদের জীবিকাই উল্টো এখন হুমকির মুখে। সেই অভিজ্ঞতায় বাংলাদেশের মতো ঘনবসতিপূর্ণ একটি দেশে ঠিক আমাদের প্রধান নদী পদ্মার পাশেই এই বিশাল আয়তন এবং অযৌক্তিক ব্যয়ের সম্পূর্ণ পরনির্ভর পারমাণবিক কেন্দ্রের স্থাপনা কোনো বিচারেই সমর্থনযোগ্য নয়। তাই দেশের সচেতন নাগরিকদের কাছে বাসদ(মার্কসবাদী)-র আহ্বান, মা-মাটি-মানুষের নিরাপত্তা রক্ষার লড়াইয়ে শামিল হোন, প্রাণ-প্রকৃতিবিধ্বংসী রামপাল ও রূপপুর প্রকল্প রুখে দাঁড়ান।

গণপরিবহনে চরম অব্যবস্থাপনার দায় কার?

(৪র্থ পৃষ্ঠার পর) সড়ক দুর্ঘটনা নিয়ে একটি জরিপ করেছে। এতে দেখা যায়, সাম্প্রতিক আলোচিত সড়ক দুর্ঘটনাগুলোর মধ্যে শুধু পুলিশের পরিদর্শক দেলোয়ার হোসেনের ক্ষেত্রে হত্যাচেষ্টার মামলা হয়েছে। বাকি মামলাগুলো দণ্ডবিধির যেসব ধারায় হয়েছে, তাতে ঘটনার মর্মান্তিকতা যথাযথ গুরুত্ব পায়নি, সাজা অপেক্ষাকৃত কম এবং মামলা জামিনযোগ্য। সাত দুর্ঘটনায় হওয়া মামলাগুলোর চারটিতে আসামিরা জামিন পেয়ে গেছে। প্রধানমন্ত্রী বললেন, মন্ত্রী ও চালকদের ভুল-ত্রুটি দেখার আগে যাত্রী কতটা সতর্ক ছিল সেটিই আগে বিবেচনা করতে হবে। তাহলে প্রশ্ন দাঁড়ায়, এ বছরে এখন পর্যন্ত ২,১২৩ জন মৃতের সবাই কি অসতর্ক ছিলেন? এই অসুস্থ রাষ্ট্রব্যবস্থার কি কোনো দায় নেই? সরকার প্রধানের এমন বক্তব্য চূড়ান্ত দায়িত্বহীনতার নামান্তর।

সাধারণ মানুষের যাতায়াতের প্রধান বাহন হলো গণপরিবহন। তাদের জীবন বিপন্ন করেই এখানে যানবাহন চলাচল করছে। এতে কেবল যাত্রীদের প্রাণ বিপন্ন হচ্ছে না, শোষিত হচ্ছে পরিবহন শ্রমিকও। জনগণের জীবনকে জিম্মি করে, শ্রমিকদের ঠকিয়ে কোটি কোটি টাকা হাতিয়ে নিচ্ছে মালিকরা। তথাকথিত শ্রমিক নেতারাও এক্ষেত্রে কোনো অংশে পিছিয়ে নেই। পরিবহন শ্রমিকদের অধিকারের কথা বলে চাঁদাবাজি, সিন্ডিকেট ব্যবসা, ভুয়া লাইসেন্সের ব্যবসাসহ অসংখ্য বেআইনি কাজ করে অঢেল বিত্ত-বৈভবের মালিক এখন তারা। দেশের সাধারণ জনগণ এবং পরিবহন শ্রমিক – সকলকে এই শোষকদের চেনা প্রয়োজন।

উন্নয়নে নাভিশ্বাস!

(শেষ পৃষ্ঠার পর) কেবল চিলমারীতে নয়, গোটা দেশেরই চিত্রটা প্রায় একই। বেশিরভাগ মানুষ ভালো নেই। সরকারের উন্নয়ন তাদের জীবনকে ছুঁতে পাচ্ছে না। কেননা এই উন্নয়ন কেবল আকাশের দিকে, উর্দ্ধমুখী। মাটির কোটি কোটি মানুষ তার কাছে অচেনা। এমন উন্নয়ন পরিস্থিতি সমস্যায় ফেলছে বেশিরভাগ মানুষকে। রিপোর্টে বলছে বাংলাদেশের ৯৭ শতাংশ মানুষ কোনো না কোনো ঝুঁকির মধ্যে আছে। অথচ উন্নয়ন হচ্ছে রাস্তাঘাটের, প্রযুক্তির, অবকাঠামোর। যদিও বিদ্যুতের দাম বেড়েছে কিন্তু আমরা 'ডিজিটাল' হয়েছি, কথা বলা রোবট এসেছে দেশে। এমনকি সব ঝুঁকি, প্রতিবাদ উপেক্ষা করে ঢুকে গেছি 'পারমাণবিক' যুগের সম্মানিত পর্বে! তবুও মানুষ ভালো নেই।

ভালো না থাকার কারণ হিসাবে অনেকে বলবে নৈতিক অবনমনের কথা। নৈতিক অবক্ষয় ঘটেছে কথাটা মিথ্যা নয়। কিন্তু নৈতিকতা জিনিসটা তো আর আকাশ থেকে পড়ে না। মানুষের মনেই থাকে তার স্থান। আর মন চলে বাস্তব জগতের শাসনে। বাস্তব পরিস্থিতিটা কেমন তাই নির্ধারণ করে দেয় নৈতিক-অনৈতিকতার শক্তিকে। চারপাশে অবারিত লুটপাট-তছরুপের পরিবেশ থাকলে, চরিত্রটাও আর উন্নত থাকে না। দুটো তো একসাথে চলতে পারে না। ফলে বোঝা যায়, লুটপাটের ব্যবস্থাটা অনৈতিকতার জন্য দায়ী। তাহলে প্রশ্ন হলো – এই ব্যবস্থাটা চালায় কারা?

বেশিরভাগ মানুষ যে চালায় না, তা তাদের পতিত দশা দেখলেই বোঝা যায়। এর বাইরে যে অল্প সংখ্যক থাকে, যারা সংখ্যায় খুব বেশি হলে ৫ শতাংশ, তাদের দেখা যাচ্ছে প্রভূত উন্নতি। এরাই রাষ্ট্র ক্ষমতায় আর প্রতিষ্ঠায় দোর্দণ্ড প্রতাপশালী। এদের একটা উন্নতির দর্শন আছে–যেটি মানবিকতা, মনুষ্যত্ব, পরিবেশ কোনো কিছুই না চিনলেও বোঝে কেবল মুনাফা। এই দর্শনটির নাম পুঁজিবাদী দর্শন। যারা এই দর্শনের ধারক, তারা হলো পুঁজিবাদী। পুঁজিবাদীরা মুনাফা আর ক্ষমতার জন্য পারে না এমন কোনো কাজ নেই। তাদের লোলুপতার সীমা-পরিসীমা নেই। ঈশপের গল্পে নেকড়ে যেমন মেষ শাবককে খাবেই, তেমনি এরা নিজেদের লাভের জন্য মানুষ, প্রাণী, পরিবেশ, নদী-নালা-খাল-বিল, বন, পাহাড়, সবকিছুকে গোগ্রাসে গিলবেই। নেকড়ের তবুও খাবার চাহিদার সীমা থাকে, এদের তাও নেই। এরা যত বেশি অপরের ধন লুট করে, তত ক্ষুধা বেড়ে যায়। বর্ধিত পাকস্থলি পূরণ করতে তখন আরও বেশি হিংস্র, বর্বর হয়ে ওঠে। বের করে শোষণের নতুন নতুন অস্ত্র। এই মুনাফা লোলুপ মানুষরা জগতের সকল প্রাণীর চেয়েও অধম।

কিন্তু এই অধমরাই সকল কিছুর শিরোমণি, তাদের সুবিধা করে দিতেই গোটা ব্যবস্থাটা সাজানো থাকে। রাষ্ট্র, সরকার সবকিছুই থাকে তাদের নিয়ন্ত্রণে। যত উন্নয়ন, অগ্রগতি সব কিছু হয় তাদের কল্যাণেই। তার ছিটেফোঁটা পেয়ে সাধারণ মানুষ কোনো রকমে দিন কাটায়। ফলে উন্নয়ন শব্দটিরও কোনো একক অর্থ নেই। কার উন্নয়ন – এই প্রশ্নটি খুব গুরুত্বপূর্ণ।

একইভাবে যেকোনো উন্নয়ন প্রকল্পের সাথে অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক, পরিবেশগত অগ্রগতির প্রশ্নটি জড়িয়ে থাকে। যদি শাসকরা ব্যাপারগুলোকে আলাদা করে দেখাতে চায়। যেমন- তারা বিদ্যুৎ উৎপাদনে রেকর্ডের কথা বলে। কিন্তু বলে না এজন্য তারা কয়েকগুণ ব্যয়বহুল, ক্ষণস্থায়ী, ভাড়াভিত্তিক প্ল্যান্ট দিয়ে বিদ্যুৎ উৎপাদন করেছে। এই বিদ্যুৎ উৎপাদনের কথা বলেই তারা সুন্দরবনের অদূরে রামপালে কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র এবং শত শত শিল্প কারখানা নির্মাণ করছে। এতে বিদ্যুৎ উৎপাদিত হলেও চিরতরে ধ্বংস হবে বাংলাদেশের ফুসফুস খ্যাত সুন্দরবন। যোগাযোগ ব্যবস্থার যুগান্তকারী পরিবর্তনের কথা বলে পদ্মা সেতুর কাজ চালালেও এখন পর্যন্ত প্রাথমিক ব্যয় থেকে তিনগুণ বেশি অর্থ খরচ করা হয়েছে। চিকিৎসা সেবার উন্নতি বোঝাতে হাসপাতাল, ক্লিনিক, নার্সিং হোমের সংখ্যা বৃদ্ধি দেখালেও পরিসংখ্যান বলছে, চিকিৎসা করতে গিয়ে দেশের ৫% মানুষ সহায়-সম্বলহীন হয়ে পড়ছে। শিক্ষা-স্বাস্থ্য-আবাসন-খাদ্য সকল ক্ষেত্রেই এই চিত্র পাওয়া যাবে। এর ফলে বেশিরভাগ মানুষ ক্রমাগত নিঃস্বকরণ প্রক্রিয়ার মধ্যে গেলেও অল্প কিছু মানুষের হাতে জমছে সম্পদের পাহাড়। ধনী আর ভিক্ষুকের সংখ্যা ক্রমেই বাড়ছে। একটা তথ্য দিলেই বোঝা যাবে সাম্প্রতিক সময়গুলোতে কী পরিমাণ অর্থ লুটপাট হয়েছে – গত সাত বছরে ছয়টি বড় আর্থিক কেলেঙ্কারিতে ৩০ হাজার কোটি টাকারও বেশি চুরি বা আত্মসাৎ হয়েছে। চুরি হওয়া টাকা কোথাও তো গেছে। কিন্তু এ টাকা উদ্ধার হয়নি, দোষীদেরও শাস্তি হয়নি। বোঝাই তো যাচ্ছে উন্নয়নটা হচ্ছে কার?

কেবল রাঘব বোয়ালরা নয়, এমন উন্নয়নের ভাগ স্থানীয় পর্যায়ের নেতা-নেত্রীরাও পায়। কয়েকদিন আগেই দেশের ২৮১ টি পৌরসভার প্রত্যেকটির জন্য ৪/৫ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। প্রকল্পটির নাম 'নগর অবকাঠামো উন্নয়ন' দেওয়া হলেও আসলে নির্বাচনের আগে স্থানীয় পৌর মেয়র, দলীয় নেতা-কর্মীদের অর্থ তছরুপের সুযোগ করে দিতেই যে এই প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়েছে, তাতে সন্দেহ নেই। শুধু তাই নয়, এমন উন্নয়নের চিত্র জনগণের সামনে তুলে ধরতে ৬০ কোটি টাকার প্রকল্প নিয়েছে গণযোগাযোগ অধিদপ্তর। এমনই উন্নয়ন করেছে সরকার যে তা জনগণকে আঙ্গুল দিয়ে দেখাতে হচ্ছে!

শাসকের এই উন্নয়ন দর্শন বুঝিয়ে দিচ্ছে দেশের অবস্থা। এ এমন এক প্রক্রিয়া যেখানে তীব্র শোষণে জনগণকে ছিড়ে ছ্যাবড়া না বানালে শাসকের অঢেল বিত্তের মালিক হওয়া সম্ভব নয়। এখানে জনগণ আর শাসকের স্বার্থ পরস্পর বিরোধী; একই সাথে দুই পক্ষেরই উন্নতি কোনোভাবেই সম্ভবপর নয়। এই চরম সত্য কথাটি আজ বুঝবার সময় এসেছে। সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণ যদি তার অবস্থার পরিবর্তন করতে চায় তবে তাকে তার নিজস্ব শক্তির উপরই দাঁড় হতে হবে। আর হতে হবে সংগঠিত। কেননা শোষণমূলক পরিস্থিতির উৎস লুকিয়ে আছে এই রাষ্ট্রের মধ্যেই। এই রাষ্ট্র ১৯৭১ সালে স্বাধীন হলেও, শাসনের মালিকানা পরিবর্তিত হলেও, শাসকের চরিত্র পাল্টায়নি। তাই একই শোষণমূলক প্রক্রিয়া জারি আছে। এই রাষ্ট্রব্যবস্থা স্বাধীনতার পর পর এদেশের উঠতি ধনিক শ্রেণিকে চোরাচালানি, মজুতদারি, পারমিট, লাইসেন্স, সম্পদ আত্মসাতের সুযোগ দিয়ে সংগঠিত হবার সুযোগ দিয়েছে। পরবর্তীতে তারাই ব্যাংক ঋণ, রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠানের মালিকানা লাভ করেছে। বেশিরভাগ রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান ধ্বংস করে দিয়ে ব্যক্তিগত মালিকানার প্রসার ঘটানো হয়েছে। এখন তারাই পুরো ব্যাংক, শিল্প-কারখানা, তেল-গ্যাস-বন্দর লুটপাটের অবাধ সুযোগ পেয়েছে। পুরো দেশটাই তাদের কাছে হয়ে উঠেছে বিক্রি করার পণ্যভূমি। উন্নয়নের যত গল্পই আমরা শুনি না কেন, সবকিছু এদের সুবিশাল পকেটে যাবার জন্যই প্রস্তুতকৃত।

এরাই নিয়ন্ত্রণ করছে দেশের রাজনীতি। এদের হাতে গণমাধ্যম, বিচারব্যবস্থা, নির্বাচন ব্যবস্থা, শিক্ষাব্যবস্থা সবকিছু কুক্ষিগত। এরাই চালাচ্ছে আওয়ামী লীগ-বিএনপি-জামাত-জাতীয় পার্টি কিংবা তথাকথিত সুশীল সমাজ ও বাম দল বলে পরিচিত জাসদ, ওয়ার্কার্স পার্টি, সাম্যবাদী দল প্রভৃতি। তাই সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণকে নিজস্ব রাজনৈতিক শক্তি গড়ে তোলার পাশাপাশি চিহ্নিত করতে হবে সেই সব শক্তিকে, যারা প্রত্যক্ষ আর পরোক্ষভাবে শাসকের পক্ষে কাজ করে। কেননা শাসকের পক্ষে থাকলে আর যাই হোক মুক্তি মিলবে না।

কুছ্ পরোয়া নেহি!

তখন সন্ধ্যা প্রায়। হানিফ ফ্লাইওভারের গোড়ায় মাইক্রোবাসে ধাক্কা লাগার পর নেমে এসে কৈফিয়ৎ তলব করেছিল রাসেল সরকার। (গ্রীন লাইন) বাসের চালক ছোট মুখে বড় কথা সহ্য করতে পারেনি। দৈত্যাকার বাসটিকে রাসেলের পায়ের ওপর চালিয়ে দেয়। মুহূর্তেই প্রায় পুরো পা-ই বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় শরীর থেকে। অ্যাপোলো হাসপাতালে জীবন-মৃত্যুর দোলাচলে থাকা রাসেলকে তাড়িয়ে ফিরছে সে দুঃসহ স্মৃতি, চিরপঙ্গুত্বের বেদনা।

ঘটনাটিকে প্রতীক হিসেবে নেওয়া যায়। বাংলাদেশে এখন যার যে ক্ষেত্রে স্টিয়ারিং, সেখানেই সে উন্মত্ত-বেপরোয়া। অন্যের জীবনের মূল্য যেন এক ফুৎকারে উড়িয়ে দেওয়া বুদ্বুদ!

রাজনীতির কথাই ধরুন। সরকার বলছে, এত উন্নয়ন আর কখনোই হয়নি। 'মাথাপিছু আয়', 'প্রবৃদ্ধি', 'মধ্যম আয়ের দেশ', বা 'উন্নয়নশীল দেশ' ইত্যাদির প্রচার এখন তুঙ্গে। প্রচারণা সত্য হলে নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচন নিয়ে শঙ্কার কিছু ছিল না। কিন্তু আমরা দেখছি উল্টো। সরকারের মন্ত্রী-এমপিদের কথায় মাঝে মাঝেই ভীতি প্রকাশ পাচ্ছে – ভোটে হারলে ঘরে থাকার উপায় থাকবে না। অতএব জিততে হবে যেকোনো মূল্যে। সকল মত-পথের অংশগ্রহণে অবাধ নির্বাচন নয়, বিরোধীদের দমন-পীড়নসহ নিয়ন্ত্রণমূলক সব কৌশল খাটিয়ে অতঃপর বলছে, 'আমরা যেভাবে চাইব, সেভাবেই ভোট হবে। আসলে আস, না আসলে নাই।' গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা, সুষ্ঠু নির্বাচনের দায় – কোনো কিছুরই পরোয়া নেই।

জননিরাপত্তা, বাক স্বাধীনতা, গণমাধ্যমের স্বাধীনতা এসবেরও কি পরোয়া আছে? যখন-তখন যে কেউ গুম হয়ে যেতে পারে। গত ২০১৪ থেকে ২০১৭ সালের জুন পর্যন্ত সাড়ে তিন বছরে নিখোঁজ বা অপহরণের শিকার হয়েছেন ২৮৪ জন। এদের মধ্যে মৃতদেহ পাওয়া গেছে ৪৪ জনের। এদের মধ্যে কেউ কেউ ফিরে আসছে, কিন্তু কণ্ঠ স্তব্ধ হয়ে যাচ্ছে। কে বা কারা তুলে নিয়েছে, কেন নিয়েছে – সব প্রশ্নই অমীমাংসিত থাকছে। ৫৭ ধারা নিয়ে এত আলোচনা-সমালোচনা, গা করার এতটুকু মনোভাব নেই।

সমাজের ভিত্তি বলা হয় অর্থনীতিকে। ভিত্তিটিই এখন সবচেয়ে নড়বড়ে। ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো পর্যুদস্ত। মালিকদের বেপরোয়া ইচ্ছা ও লক্ষ্যপূরণের হাতিয়ার ব্যাংকগুলোতে ঋণ দেয়ার শর্ত ও সীমা – কোনোকিছুরই বালাই নেই। সরকারের উপদেষ্টা, সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, সরকার সমর্থক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, ছাত্র সংগঠনের সাবেক নেতা – লুটের অংশীদার কে নয়? ফারমার্স ব্যাংক এখন দেউলিয়া, চেয়ারম্যানের বেধড়ক লুটপাটে ধুঁকছে বেসিক ব্যাংক। সিপিডিও বলছে, 'ব্যাংকগুলো এতিম ও বিকলাঙ্গ হয়ে গেছে।' সরকারি ব্যাংকগুলোর খেলাপি ঋণের পরিমাণ প্রায় ২৯ হাজার কোটি টাকা। সব মিলিয়ে খেলাপি ঋণ সোয়া লক্ষ কোটি টাকা। বেসিক ব্যাংককে পথে বসানো আবদুল হাই বাচ্চুর দুর্নীতি দিবালোকের মতো স্পষ্ট হলেও দীর্ঘসময় সরকার কর্ণপাতই করেনি। ১০ বছরে ছয় লক্ষ কোটি টাকা যারা পাচার করেছে তাদের একজনকেও খুঁজে বের করা হয়নি। এদিকে ৬ মে খবর বেড়িয়েছে, ১২.৪৯ কোটি টাকা ঋণের দায়ে কুমিল্লার সাড়ে চার হাজার কৃষকের নামে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি হয়েছে। 'আইনের চোখে সকলেই সমান' – আইন কার দিকে বোঝাই যাচ্ছে।

বড় বড় আর্থিক প্রকল্পগুলোর দিকে তাকালে দেখতে পাওয়া যাবে, সর্বশেষ ব্যয় প্রাথমিক বাজেটের কয়েকগুণ হয়ে যাচ্ছে। ইউরোপ-আমেরিকার চেয়েও অন্তত তিন গুণ বেশি ব্যয়ে রাস্তা নির্মাণের বিষয়ে প্রশ্ন তুলতে পারেন, কিন্তু তা হাওয়ায় মিলিয়ে যাবে। উন্নয়নের মাশুল হিসেবে দফায় দফায় বেড়েছে *(২য় পৃষ্ঠায় দেখুন)*

সিরিয়ায় কথিত রাসায়নিক হামলা

মার্কিন মদদে নাটক সাজায় জঙ্গিরা

১৪ এপ্রিল ২০১৮, সিরিয়ার অন্য শহরের মতো দামাস্কাস ও হোমস শহরের মানুষ ঘুমিয়ে। ভোর রাতে কিছু বুঝে ওঠার আগেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র মুহুর্মুহু ১০৫ মিসাইল হামলায় ধ্বংসস্তূপে পরিণত শহর দুটি। আন্তর্জাতিক সমস্ত নিয়মকানুনকে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়ে স্বাধীন দেশ সিরিয়ায় মিসাইল হামলায় মার্কিনিদের সহযোগী ছিল ব্রিটেন ও ফ্রান্স। ইরাকের পর আবারও ইঙ্গ-মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীদের আগ্রাসন দেখল সিরিয়া তথা বিশ্ববাসী।

রবার্ট ফিস্কের অনুসন্ধানী প্রতিবেদন

সিরিয়ার দৌমা শহরে সাধারণ মানুষের ওপর দেশটির সেনাবাহিনীর কথিত রাসায়নিক গ্যাস হামলার অভিযোগের জবাব দিতে এই মিসাইল আক্রমণের কথা জানায় মার্কিন-ব্রিটেন ও ফ্রান্সের সরকারগুলো। ন্যূনতম তথ্য উপাত্ত ও ভিডিও ছবিগুলো যাচাই বাছাই করা ছাড়াই হামলার দায় চাপিয়েছে সিরিয়ায় ক্ষমতাসীন বাশার আল আসাদ সরকারের উপর। আর এই সংবাদ ফলাও করে প্রকাশ করে তাদের মদদপুষ্ট আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমগুলো।

রাসায়নিক অস্ত্র হামলার ভুয়া অভিযোগ তুলে হামলা

রাতের আঁধার যেমন কাটে সূর্যের আলোয়, তেমনি সিরিয়ায় মার্কিনিদের নগ্ন হস্তক্ষেপের মুখোশ খুলতে খুব বেশিদিন অপেক্ষা করতে হয়নি। গোয়েবোলসের কায়দায় প্রচারিত ডাহা মিথ্যার জারিজুরি ফাঁস করেছেন প্রখ্যাত সাংবাদিক রবার্ট ফিস্ক। ব্রিটেনের প্রভাবশালী দৈনিক দ্যা ইন্ডিপেনডেন্ট পত্রিকায় সম্প্রতি বিস্তারিত তুলে ধরেছেন এই অনুসন্ধানী সাংবাদিক। গত ১৫ এপ্রিল সিরিয়ার গৌতা শহরে কথিত দেশটির সেনাবাহিনীর রাসায়নিক হামলার ঘটনাস্থলে পৌছে অনুসন্ধানে নামে মধ্যপ্রাচ্য ও যুদ্ধ সংবাদ *(৪র্থ পৃষ্ঠায় দেখুন)*

উন্নয়নে নাভিশ্বাস!

কুড়িগ্রাম জেলার চিলমারী উপজেলার এক স্বনামধন্য সাংবাদিক ছিলেন মোনাজাত উদ্দিন। সারাজীবন ওই অঞ্চলের গরিব-খেটে খাওয়া মানুষের সাথে তিনি তাঁর জীবন অতিবাহিত করেছেন। গভীরভাবে দেখেছেন সমাজের প্রান্তিক মানুষদের নিয়ে শাসকদের রাজনীতি। তাই একটি বইয়ের উৎসর্গপত্রে তিনি লিখেছিলেন, 'যারা ভোটের সময় ভোট নেয় কিন্তু তারপর মানুষের কাছ থেকে দূরে সরে যায়, তাদের জন্য আমার সমস্ত ঘৃণা। যারা মানুষের উন্নয়নের কথা বলে কিন্তু ক্ষমতায় যাবার পর নিজের সম্পদ গড়ে, তাদের জন্য আমার সমস্ত ধিক্কার।' শাসকদের তথাকথিত উন্নয়নকে কটাক্ষ করে লিখেছেন, 'গোটা দেশের উন্নয়ন বলতে কি থানা সদর কেন্দ্র কিংবা আশপাশের দু-একটি ইউনিয়নের পাকা সড়ক আর বিদ্যুৎ সম্প্রসারণ? থানা প্রশাসনিক ভবনের চাকচিক্য, নতুন নতুন মোটর সাইকেলের আমদানি, সিনেমা হল? কিছু নতুন টিভি সেটের এন্টেনা?

উন্নয়নের নামে চিলমারীতে এক যুগে এ-ই হয়েছে। অথচ হয়নি কোনো শিল্প-কারখানা। হয়নি একটি হিমাগার। এই অঞ্চলের পাট দিয়ে দড়ি-সুতলির কারখানা হতে পারে, বিভিন্ন কৃষিভিত্তিক ছোট ছোট কারখানা হতে পারে, এসব হয়নি।' হয়নি বলেই সর্বশেষ খানা জরিপ মতে ৭৭ শতাংশ গরীব মানুষের বাস চিলমারীতে। হয়নি বলেই কুড়িটি নদ-নদীর জেলাবাসী সবচেয়ে কম মাছ খেতে পায়। দেশের মধ্যে সবচেয়ে বেশি অপুষ্টির শিকার এ অঞ্চলের মানুষ। এ অঞ্চলে আজও কলার থোড়, গাছআলু অনেক মানুষের খাদ্য। এই বুভুক্ষু-নিরন্ন মানুষগুলোর কাছে দেশের বড় বড় শহরের সুউচ্চ দালান কোটা, কোটি টাকার প্রাইভেট কার আর আলো ঝলমলে বিপণিবিতানের 'উন্নয়ন' কেবলই পরিহাস। আর মোনাজাতউদ্দিন যাদের প্রতি সুতীব্র ঘৃণা আর ধিক্কার জানিয়েছিলেন, তারাই এই উন্নয়নের ফেরিওয়ালা।

এমন দুঃসহ অবস্থাটা *(৭ম পৃষ্ঠায় দেখুন)*

রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ প্রকল্প

মা-মাটি-মানুষের নিরাপত্তার জন্য হুমকি

২০১৮-১৯ অর্থবছরে এডিপির সবচেয়ে বড় অর্থ বরাদ্দ করা হয়েছে বিতর্কিত রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ প্রকল্পের জন্যে। সার্বিক প্রকল্প ব্যয় ৩২,০০০ কোটি টাকা থেকে বেড়ে, ইতোমধ্যে লক্ষ-কোটির ঘর ছাড়িয়ে এটি এখন দেশের রেকর্ড ব্যয়ের প্রকল্প। অবশ্য শুধু দেশে কেন? সাম্প্রতিককালে প্রায় সব 'মেগা' প্রকল্পে ব্যয়ের হারের দিক থেকে বাংলাদেশ গোটা বিশ্বেই অপ্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে উঠেছে, যদিও মানের প্রশ্ন তুললেই 'উন্নয়নবিরোধী' তকমা জোটে!

দেশের ভেতরে-বাইরে প্রচণ্ড বিরোধিতা সত্ত্বেও এরই মাঝে প্রকল্পটির প্রথম পর্যায়ের ঢালাই সম্পন্ন করা হয়েছে। অথচ পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রের যে প্রধান বিপদ, তার বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, সেই বিষয়টিরই কোনো সুরাহা করা হয়নি। সমালোচনার মুখে সরকারের তরফে জানানো হলো, আসছে জুনে রাশিয়ার সাথে চুক্তি হবে যাতে তারা 'স্পেন্ট ফুয়েল' ফেরত নিয়ে যায়। কিন্তু ফুকুশিমা দুর্ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে পাস হওয়া রাশিয়ার আইনে স্পষ্ট বলা আছে অন্য দেশ থেকে পারমাণবিক বর্জ্য 'রিসাইকেলের' জন্যে আনা হলেও অন্য কোনো দেশের বর্জ্য সেখানে স্থায়ীভাবে সংরক্ষণ করা যাবে না।

উপরন্তু বিদ্যমান চুক্তিতে বিদ্যুৎকেন্দ্রে কোনো দুর্ঘটনা ঘটলে তার সম্পূর্ণ দায় বর্তাবে বিদ্যুৎকেন্দ্রের মালিকের উপর, যাতে চুক্তি মতো নাম আছে বাংলাদেশের। পার্শ্ববর্তী দেশ ভারতে কিন্তু চুক্তির শর্ত আলাদা। ২০১০ সালে ভারতে পাস হওয়া আইন অনুযায়ী দুর্ঘটনা যদি নির্মাণকারী প্রতিষ্ঠানের কারণে হয়েছে বলে প্রতীয়মান হয়, তবে তার দায় তাকেও বইতে হবে। এবং সেখানে ঠিকাদার প্রতিষ্ঠানকে এর মধ্যেই চারটি নিম্ন মানসম্পন্ন পাইপ বদলে দিতে হয়েছে যা ভারতীয় বিজ্ঞানীরা সনাক্ত করেছিলেন।

ব্যয়ের হিসাব শিকেয় তুলে রাখলেও এমন ঘটনা আমাদের ক্ষেত্রে ঘটলে যে আমরা বুঝতে পারব – সেরকম নিশ্চয়তাই আমাদের নেই। পরমাণু কমিশনে কাজ করা সাবেক একাধিক জ্যেষ্ঠ কর্মকতা কদিন আগেও দক্ষ জনবলের এই সংকটের কথা তুলে ধরেছেন। যদিও বুয়েট এবং ঢাবিতে এ সংক্রান্ত বিভাগ খোলা হয়েছে, কিন্তু তা এই বিশালায়তন প্রকল্পের তুলনায় নিতান্তই অপ্রতুল, এমনটাই 'দৈনিক প্রথম আলো'কে দেওয়া মতামতে তাঁরা জানিয়েছেন।

আরও ভয়ের ব্যাপার হলো এই প্রকল্পে ঠিকাদারী নিয়েছে রাশিয়ান প্রতিষ্ঠান। যাবতীয় সমীক্ষাও করছে তারা। এবং সেইসব সমীক্ষার তত্ত্বাবধানের দায়িত্বেও আছে রাশিয়া। ভবিষ্যতে যারা বাংলাদেশের হয়ে কাজগুলো দেখভাল করবেন বলে বলা হচ্ছে, তারাও প্রশিক্ষণ নিচ্ছেন সেই রাশিয়া থেকেই। এখানে তৃতীয় কোনো অভিজ্ঞ পক্ষ বা বিশেষজ্ঞ যাচাই কমিটির কোনো ব্যবস্থাই রাখা হয়নি। দেশের মা-মাটি-মানুষের নিরাপত্তার কোনো তোয়াক্কা, এখন পর্যন্ত পরিবেশগত *(৭ম পৃষ্ঠায় দেখুন)*

সম্পাদক : শুভ্রাংশু চক্রবর্তী। বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল (মার্কসবাদী) কর্তৃক ২২/১ তোপখানা রোড (৬ষ্ঠ তলা), ঢাকা- ১০০০ থেকে প্রকাশিত।
ফোন ও ফ্যাক্স : ৯৫৭৬৩৭৩। ওয়েবসাইট : www.spbm.org । ই-মেইল : mail@spbm.org